শিক্ষা

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁহার পুত্র কন্যা জামাতা ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১১। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারের বিভিন্ন জনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী

প্রথম খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের বিভিন্ন পর্বে লিখিত অগণিত চিঠিপত্র প্রাচুর্যের দিক দিয়া রবীন্দ্র-রচনার একটি প্রধান অংশ ; কবির মানসলোকের অনেক মহলের রহস্যকুঞ্চিকা এই চিঠিপত্রের মধ্যেই গোপন আছে, এবং রবীন্দ্র-জীবনীসৌধ গঠনের অনেক উপকরণ এই পত্রধারার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই চিঠিপত্রের যতটা অংশ এ-পর্যন্ত গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ হইয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে আবদ্ধ আছে।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশবিভাগ এই-সকল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া চিঠিপত্র নামে পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ইতিপূর্বে, কবির জীবিতকালে, ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী এবং পথে ও পথের প্রান্তে নামে তিন খণ্ড পত্রসংগ্রহ তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ; রচয়িতার চিরন্তন অধিকারবলে তিনি এই-সকল গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রের বহু-স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়াছেন। চিঠিপত্র নামে এখন যে-সকল পত্রসংগ্রহ বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে তাহাতে একান্ত অন্তরঙ্গ বা অবান্তর কোনো অংশ ভিন্ন পরিবর্জনের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব না, এবং পাঠের কোনো পরিবর্তন করিব না ; বর্জিত অংশ যথারীতি চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইবে। তাঁহার মূল চিঠির বানান ও ক্ষুদ্রতম চিহ্নাদি পর্যন্ত অবিকল রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষকে লেখা চিঠি যথেষ্ট-সংখ্যক থাকিলে, পত্রে উল্লিখিত বা অনুমিত কালানুক্রমে সেগুলি একখণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

চিঠিপত্রের প্রথম খণ্ডে সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত কবির ছত্রিশ-খানি চিঠি মুদ্রিত হইল। পত্নীর মৃত্যুর (৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯) পর এই কয়-খানি চিঠি কবির লক্ষ্যগোচর হইয়াছিল, ও এতদিন সেগুলি তিনি রক্ষা

করিয়া আসিয়াছিলেন। সহধর্মিণীকে লিখিত কবির আর কোনো চিঠি এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, সম্ভবত রক্ষিতও হয় নাই।

মৃণালিনী দেবীর লিখিত তিনখানি চিঠি আমরা পাইয়াছি, তাহাও গ্রন্থ-শেষে মুদ্রিত হইল। কবিকে লিখিত তাঁহার কোনো চিঠি আমাদের সন্ধান-গোচর হয় নাই।

চিঠিপত্রের বর্তমান খণ্ডের সম্পাদনায় শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। আগামী খণ্ডগুলির সম্পাদনায়ও তাঁহার আনুকূল্য পাইব, এই আশা করি এবং তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

শ্রীনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৪৯

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

বর্তমান সংস্করণে মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠির তারিখ রবীন্দ্র-ভবনের সহায়তায় সংশোধন করা হইয়াছে; এবং পত্রগুলি তদনুযায়ী বিন্যস্ত হইয়াছে।

পূর্ববর্তী সংস্করণে মৃণালিনী দেবীর লিখিত তিনখানি পত্র মুদ্রিত হয়, বর্তমানে তাঁহার লেখা আরও পাঁচখানি পত্র সংযোজিত হইল; পত্রগুলি রবীন্দ্র-ভবন সংগ্রহে আছে।

এই সংস্করণে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি আলোকচিত্র ও পাণ্ডুলিপিচিত্র মুদ্রিত হইল।

গ্রন্থশেষে মৃণালিনী-প্রসঙ্গ এই সংস্করণে নূতন সংযোজন।

১ মাঘ ১৩৭২

বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত মৃণালিনী দেবীর দুইখানি চিঠি, মৃণালিনী দেবীকে লিখিত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অভিজ্ঞা দেবী, নীতীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মৃণালিনী দেবী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত কয়েকটি পত্রাংশ সংযোজিত হইল।

মৃণালিনী দেবীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'মৃণালিনী দেবী' (২২ শ্রাবণ ১৩৮১) গ্রন্থ ও অন্য কতকগুলি প্রধান সূত্র অবলম্বনে, মৃণালিনী দেবী সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা বিস্তারিত পরিচয় বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

পুলিনবিহারী সেনের নির্দেশেই এই সংস্করণের কাজ শুরু হয়, তাঁর সহায়তার কথাই এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। পরবর্তীকালে বিন্যাসে সহায়তা করেছেন শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব, শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, শ্রীশঙ্খ ঘোষ এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী।

বৈশাখ ১৪০০

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি
স্মৃতির খেলেনা-কটি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবিচন্দ্রতারা,
তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই কটি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে; বলেছিলে মনে
'অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে।'
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে!
জগতের কারো নয় তবু তারা আছে!
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ
তোমারে তেমনি আজ রাখে নি কি কেহ?

—স্মরণ

২ পৌষ [১৩০৯]
বোলপুর

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু'চারিটি
স্মৃতির খেলেনা গুলি বহুযত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ধরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবিচন্দ্রতারা
তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই কটি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে,— বলেছিলে মনে
অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে!
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে
জগতের কারো নয়, তবু তারা আছে!
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ
তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ

২৫. পৌষ।
বোলপুর।

১

[সাহাজাদপুর। জানুয়ারি ১৮৯০]

ওঁ

ভাই ছোটবউ—

যেম্‌নি গাল দিয়েছি অম্‌নি চিঠির উত্তর এসে উপস্থিত। ভালমানুষির কাল নয়। কাকুতি মিনতি করলেই অম্‌নি নিজমূর্ত্তি ধারণ করেন আর দুটো গালমন্দ দিলেই একবারে জল। এ'কেই ত বলে বাঙ্গাল। ছি, ছি, ছেলেটাকে পর্য্যন্ত বাঙ্গাল করে তুল্লে গা! আজ এতক্ষণ এক দল লোক উপস্থিত ছিল— তোমাদের চিঠি যখন এল তখন খুব কথাবার্ত্তা চল্‌চে চিঠিও খুল্‌তে পারিনে, উঠ্‌তেও পারিনে। একদল উকীল আর স্কুলের মাষ্টার এসেছিল। আমার বই স্কুলে চালাবার জন্য কথাবার্ত্তা কয়ে রেখেছি কেবল বই আর পাচ্চিনে। কই, আজও ত বই এসে পৌঁছল না। ভাল গেরোতেই ফেলেছ! রাজর্ষি যে-খানা আমার কাছে ছিল সেইটেই ইন্‌স্পেক্টরের হাতে দিয়েছি, নদিদির গল্পসল্পও দিয়েছি। আবার ইন্‌স্পেক্টরের গলা ভেঙ্গে গেছে বলে তাকে হোমিয়োপ্যাথি ওষুধও দিয়েছি— এতে অনেক ফল হতে পারে— তার গলা ভাঙ্গা না সারলেও তবু মনটা প্রসন্ন থাক্‌বে। দেখ্‌চ, বসে বসে কত উপার্জ্জনের উপায় করচি! সকালে উঠেই বই লিখ্‌তে বসেছি তাতে কত টাকা হবে একবার ভেবে দেখ! ছাপাবার সমস্ত খরচ না উঠুক্ নিদেন দশ পঁচিশ টাকাও উঠ্‌বে। এইরকম উঠে পড়ে লাগ্‌লে তবে টাকা হয়! তোমরা ত কেবল

খরচ কর্ত্তে জান— এক পয়সা ঘরে আন্‌তে পার? কুঞ্জ লিখেছে জিনিষপত্র বিরাহিমপুরে পাঠিয়েছে সেখান থেকে বোধ হয় কাল এখানে এসে পৌঁছতে পারে। আমাদের সাহেব আস্‌বেন পর্শু দিন। সেদিন আমার কি শুভদিন! আমার কি আনন্দ! আমার সাহেব আস্‌বে আবার আমার মেমও আস্‌বে! হয়ত আমার ঘরে এসে খানা খেয়ে যাবে— নয়ত বল্‌বে— বাবু, আমার সময় নেই! আমার কত ভাগ্যি! প্রার্থনা করি, যেন তার সময় না থাকে। কিন্তু খাবার নাম শুন্‌লে যে সময়ের অভাব হবে এমন ত আমার আশা হয় না!— বেলি খোকার জন্যে এক একবার মনটা ভারি অস্থির বোধ হয়। বেলিকে আমার নাম করে দুটো "অড্" খেতে দিয়ো। আমি না থাক্‌লে সে বেচারা ত নানা রকম জিনিষ খেতে পায় না। খোকাকেও কোন রকম করে মনে করিয়ে দিয়ো। আমার পশমের ছবি দেখে সে আমাকে চিন্‌তে পারে এ শুনে আমি বড় খুসি হলুম না।— আশু যে বলেছিল সেই একশো টাকা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দেবে— আবার টাকা চেয়েছে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

[২৯ অগস্ট ১৮৯০]

ওঁ

শ্যাম

শুক্রবার

ভাই ছোট বৌ—

আজ আমরা এডেন্ বলে এক জায়গায় পৌঁছব। অনেক দিন পরে ডাঙ্গা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে নাব্‌তে পারব না, পাছে সেখান থেকে কোন রকম ছোঁয়াচে ব্যামো নিয়ে আসি। এডেনে পৌঁছে আর একটা জাহাজে বদল করতে হবে, সেই একটা মহা হাঙ্গাম রয়েছে। এবারে সমুদ্রে আমার যে অসুখটা করেছিল সে আর কি বল্‌ব— তিন দিন ধরে যা' একটু কিছু মুখে দিয়েছি অম্‌নি তখনি বমি করে ফেলেচি— মাথা ঘুরে গা ঘুরে অস্থির— বিছানা ছেড়ে উঠিনি— কি করে বেঁচে ছিলুম তাই ভাবি। রবিবার দিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হল আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যোড়াসাঁকোয় গেছে। একটা বড়ো খাটে একধারে তুমি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে বেলি খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটু আধটু আদর করলুম আর বল্লুম ছোট বৌ মনে রেখো আজ রবিবার রাত্তিরে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম— বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব তুমি আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলে কি না। তার পরে বেলি খোকাকে হাম দিয়ে ফিরে চলে এলুম। যখন ব্যামো নিয়ে পড়ে ছিলুম তোমরা আমাকে মনে করতে কি? তোমাদের

কাছে ফেরবার জন্যে ভারি মন ছট্‌ফট্‌ করত। আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির মত এমন জায়গা আর নেই— এবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়বনা। আজ এক হপ্তা বাদে প্রথম স্নান করেছি। কিন্তু স্নান করে কোন সুখ নেই— সমুদ্রের নোনা জলে নেয়ে সমস্ত গা চট্‌চট্‌ করে— মাথার চুল গুলো একরকম বিশ্রি আটা হয়ে জটা পাকিয়ে যায়— গা কেমন করে। মনে করচি যতদিন না জাহাজ ছাড়ব আর স্নান করব না। ইউরোপে পৌঁছতে এখনো হপ্তাখানেক আছে— একবার সেইখানে পৌঁছে ডাঙ্গায় পা দিলে বাঁচি। এই দিন রাত্রি সমুদ্র আর ভাল লাগে না। আজকাল যদিও সমুদ্রটা বেশ ঠাণ্ডা হয়েচে, জাহাজ তেমন দুল্‌চে না, শরীরেও কোন অসুখ নেই— সমস্ত দিন জাহাজের ছাতের উপরে একটা মস্ত কেদারার উপরে পড়ে, হয় লোকেনের সঙ্গে গল্প করি, নয় ভাবি, নয় বই পড়ি। রাত্তিরেও ছাতের উপরে বিছানা করে শুই, পারৎপক্ষে ঘরের ভিতরে ঢুকিনে। ঘরের মধ্যে গেলেই গা কেমন করে ওঠে। কাল রাত্তিরে আবার হঠাৎ খুব বৃষ্টি এল— যেখানে বৃষ্টির ছাঁট নেই সেইখানে বিছানাটা টেনে নিয়ে যেতে হল। সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত ক্রমাগতই বৃষ্টি চল্‌চে। কাল বেড়ে রোদ্দুর ছিল। আমাদের জাহাজে দুটো তিনটে ছোট ছোট মেয়ে আছে— তাদের মা মরে গেছে, বাপের সঙ্গে বিলেত যাচ্চে। বেচারাদের দেখে আমার বড় মায়া করে। তাদের বাপটা সর্ব্বদা তাদের কাছে কাছে নিয়ে বেড়াচ্চে— ভাল করে কাপড় চোপড় পরাতে পারেনা, জানে

না কি রকম করে কি করতে হয়। তারা বৃষ্টিতে বেড়াচ্চে, বাপ এসে বারণ করলে, তারা বল্লে আমাদের বৃষ্টিতে বেড়াতে বেশ লাগে— বাপটা একটু হাসে, বেশ আমোদে খেলা করচে দেখে বারণ করতে বোধ [হয়] মন সরে না। তাদের দেখে আমার নিজের বাচ্ছাদের মনে পড়ে। কাল রাত্তিরে বেলিটাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম— সে যেন ষ্টীমারে এসেচে— তাকে এমনি চমৎকার ভাল দেখাচ্চে সে আর কি বলব— দেশে ফেরবার সময় বাচ্ছাদের জন্যে কি রকম জিনিষ নিয়ে যাব বল দেখি। এ চিঠিটা পেয়েই যদি একটা উত্তর দাও তা হলে বোধ হয় ইংলণ্ডে থাকৃতে থাকৃতে পেতেও পারি। মনে রেখো মঙ্গলবার দিন বিলেতে চিঠি পাঠাবার দিন। বাচ্ছাদের আমার হয়ে অনেক হামি দিয়ো— আর তুমিও নিও।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

['ম্যাসালিয়া' জাহাজ। ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯০]

ওঁ

ভাই ছোট গিন্নি—

পর্শু তোমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছি— আজ আবার আর একটা লিখ্‌চি— বোধ হয় এ দুটো চিঠি এক দিনেই পাবে— তাতে ক্ষতি কি? কাল আমরা ডাঙ্গায় পৌঁছব— তাই আজ তোমাকে লিখে রাখ্‌চি। আবার সেই ইংলণ্ডে পৌঁছে তোমাদের লেখবার সময় পাব। যদি যাতায়াতের গোলমালে

এর পরের হপ্তায় চিঠি ফাঁক যায় তা হলে কিছু মনে কোরোনা। জাহাজে চিঠি লেখা বিশেষ শক্ত নয়— কিন্তু ডাঙ্গায় উঠে যখন ঘুরে বেড়াব, কখন্ কোথায় থাক্‌ব তার ঠিকানা নেই— তখন দুই একটা চিঠি বাদ যেতেও পারে। আমরা, ধরতে গেলে পশু´ থেকে য়ুরোপে পৌঁচেছি। মাঝে মাঝে দূর থেকে য়ুরোপের ডাঙ্গা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমাদের জাহাজটা এখন্ ডান দিকে গ্রীস্ আর বাঁ দিকে একটা দ্বীপের মাঝখান দিয়ে চলেছে। দ্বীপটা খুব কাছে দেখাচ্চে— কতকগুলো পাহাড়, তার মাঝে মাঝে বাড়ি, এক জায়গায় খুব একটা মস্ত সহর— দূরবীন দিয়ে তার বাড়িগুলো বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম —সমুদ্রের ঠিক ধারেই নীল পাহাড়ের কোলের মধ্যে শাদা সহরটি বেশ দেখাচ্চে। তোমার দেখ্‌তে ইচ্ছে করচেনা ছুটকি? তোমাকেও একদিন এই পথ দিয়ে আস্‌তে হবে তা জান? তা মনে করে তোমার খুসি হয় না? যা কখনো স্বপ্নেও মনে কর নি সেই সমস্ত দেখ্‌তে পাবে। দুদিন থেকে বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়ে আস্‌চে— খুব বেশি নয়— কিন্তু যখন ডেকে বসে থাকি, এবং জোরে বাতাস দেয় তখন একটু শীত-শীত করে। অল্পস্বল্প গরম কাপড় পরতে আরম্ভ করেছি। আজকাল রাত্তিরে "ডেকে" শোওয়াটাও ছেড়ে দিতে হয়েচে। জাহাজের ছাতে শুয়ে লোকেনের দাঁতের গোড়া ফুলে ভারি অস্থির করে তুলেছিল। আমরা যে সময়ে এসেছি নিতান্ত অল্প শীত পাব— দার্জিলিঙ্গে যেরকম শীত ছিল তার চেয়ে ঢের কম। ছাড়বার সময়-সময় একটু শীত হবে হয়ত। আমি অনেকগুলো

অদরকারী কাপড় চোপড় এবং সেই বালাপোষখানা মেজ-বোঠানের হাত দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি— সেগুলো পেয়েছ ত ? না পেয়ে থাক ত চেয়ে নিয়ো। সেগুলো একবার লক্ষ্মীর হাতে পড়লে সমস্ত মেজবোঠানের আলমারির মধ্যে প্রবেশ করবে। বেলির জন্যে আমি একটা কাপড় আর পাড় কিনে মেজবোঠানদের সঙ্গে পাঠিয়েছি— সেটা এতদিনে অবিশ্যি পেয়েছ— খুব টুক্‌টুকে লাল কাপড়— বোধ হয় বেলিবুড়িকে তাতে বেশ মানাবে— পাড়টাও বেশ নতুন রকমের— না ? মেজবোঠানও বেলির জন্যে তার একটা প্রাইজের কাপড় নিয়েচেন— নীলেতে শাদাতে— সেটাও বেলু রাণুকে বেশ মানাবে। সেটা যে রকমের ভাবুনে, নতুন কাপড় পেয়ে বোধহয় খুব খুসী হয়েচে। আমাকে কি সে মনে করে ? খোকাকে ফিরে গিয়ে কি রকম দেখ্‌ব কে জানে। ততদিনে সে বোধ হয় দুটো চারটে কথা কইতে পারবে। আমাকে নিশ্চয় চিন্‌তে পারবে না। হয়ত এমন ঘোর সাহেব হয়ে আস্‌ব তোমরাই চিন্‌তে পারবে না। আমার সেই আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল এখন সেরে গেছে— কিন্তু খুব দুটো গর্ত্ত হয়ে আছে— ভয়ানক কেটে গিয়েছিল। অনেক দিন বাদে কাল পর্শু দুদিন স্নান করেচি— আবার পর্শুদিন প্যারিসে পৌঁছে নাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। সেখেনে টার্কিষ্‌ বাথ্‌ বলে একরকম নাবার বন্দোবস্ত আছে তাতে খুব করে পরিষ্কার হওয়া যায়— বোধ হয় আমার "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে" তার বিষয় পড়েচ— যদি সময় পাই ত সেইখেনে নেয়ে

নেব মনে করচি। আমার শরীর এখন বেশ ভাল আছে— জাহাজে তিন বেলা যেরকম খাওয়া চলে তাতে বোধ হচ্চে আমি একটু মোটা হয়ে উঠেচি। আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে যেন বেশ মোটাসোটা সুস্থ দেখ্‌তে পাই ছোটবউ। গাড়িটা ত এখন্‌ তোমারি হাতে পড়ে রয়েছে রোজ নিয়মিত বেড়াতে যেয়ো, কেবলি পরকে ধার দিয়ো না। কাল রাত্তিরে আমাদের জাহাজের ছাতের উপর ষ্টেজ্‌ খাটিয়ে একটা অভিনয়ের মত হয়ে গেছে— নানা রকমের মজার কাণ্ড করেছিল— একটা মেয়ে বেড়ে নেচেছিল। তাই কাল শুতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আজ জাহাজে শেষ রাত্তির কাটাব। তোমাদের সকলকে হামি দিয়ে চিঠি বন্ধ করি।

রবি

৪

৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯০

ওঁ ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৮৯০

প্যারিস

ভাই ছোট বৌ— আমরা ইফেল টাউয়ার বলে খুব একটা উঁচু লৌহস্তম্ভের উপর উঠে তোমাকে একটা চিঠি পাঠালুম। আজ ভোরে প্যারিসে এসেচি। লণ্ডনে গিয়ে চিঠি লিখ্‌ব। আজ এই পর্য্যন্ত। ছেলেদের জন্যে হামি।
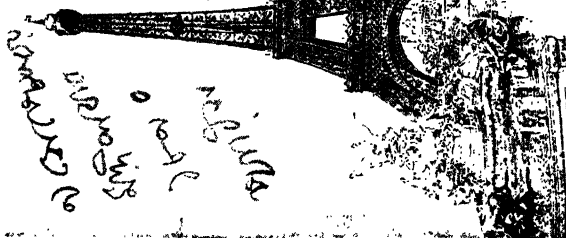
NOTA. — Prière à la personne qui trouvera cette Carte, d'indiquer la date, l'heure et le lieu où elle aura été recueillie et de l'expédier à l'adresse ci-contre par le plus proche bureau de poste.

[কালিগ্রাম। ডিসেম্বর ১৮৯০]

ওঁ

ভাই ছোটবউ—

আজ আমি কালিগ্রামে এসে পৌঁছলুম। তিনদিন লাগ্‌ল। অনেক রকম জায়গার মধ্যে দিয়ে আস্‌তে হয়েছে। প্রথমে বড় নদী— তার পরে ছোট নদী, দুধারে গাছ-পালা, চমৎকার দেখ্‌তে,— তারপরে নদী ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, নিতান্ত খালের মত, দুধারে উঁচু পাড়, ভারি বদ্ধ ঠেকে। তার পরে একজায়গায় ভয়ানক তোড়ে জল বেরিয়ে আস্‌চে ২০।২৫ লোকে ধরে আমাদের নৌকো টেনে নিয়ে এল। একটা মস্ত বিল আছে তার নাম চলন বিল। সেই বিলের থেকে জল নদীতে এসে পড়চে। তারপরে ঠেলে ঠুলে অনেক কষ্টে এবং অনেক বিপদ এড়িয়ে বিলের মধ্যে এসে পড়লুম— চারদিকে জল ধূ ধূ করচে, মাঝে মাঝে ঝোপঝাপ ঘাস জমি— একটা মস্ত মাঠে বর্ষার জল দাঁড়ালে যে রকম হয়— মাঝে মাঝে বোট মাটিতে ঠেকে যায়, প্রায় একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা ধরে ঠেলাঠুলি করে তবে তাকে জলে ভাসাতে পারে।— ভয়ানক মশা। মোদ্দা কথাটা, এই বিলটা আমার একেবারেই ভাল লাগেনি। তারপরে মাঝে মাঝে ছোট ছোট নদী, মাঝে মাঝে বিল। এমনি করে ত এসে পৌঁচেছি। আবার এই রাস্তা দিয়ে যে বিরাহিমপুরে যেতে হবে সেটা আমার কিছুতেই মনঃপূত হচ্চে না। এখানকার নদীতে একেবারেই স্রোত নেই। শেওলা

SEA POST OFFICE 23 SEP 90

PARIS A MODANE 11 SEPT. 90

CARTE POSTALE

Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse.

PARIS 27 R. ST DOMINIQUE

M^rs R. Tagore

6 Dwarkanath Tagore's Lane

Jorasanko

Calcutta

India

ভাস্‌চে, মাঝে মাঝে জঙ্গল হয়েছে— পাড়াগেঁয়ে পুকুরের যে একরকম গন্ধ পাওয়া যায়, সেইরকম গন্ধ— তা ছাড়া রাত্তিরে বোধ হয় যথেষ্ট মশা পাওয়া যাবে। নিতান্ত অসহ্য হলে এইখান থেকেই কলকাতায় পালাব। আমার মিষ্টি বেলুরাণুর চিঠি পেয়ে তখনি বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। আমার জন্যে তার আবার মন কেমন করে— তার ত ঐ একটুখানি মন, তার আবার কি হবে? তাকে বোলো আমি তার জন্যে অনেক "অড়্" আর জ্যাম্ নিয়ে যাব। কাল রাত্তিরে আমি খোকাকে স্বপ্ন দেখেছি— তাকে যেন আমি কোলে নিয়ে চট্‌কাচ্চি, বেশ লাগ্‌চে। সে কি এখন কথাবার্ত্তা বল্‌তে আরম্ভ করেছে— আমার ত মনে হচ্চে বেলা ওর বয়সে বিস্তর বোলচাল বের করেছিল। তোমাদের ওখেনে শীত নেই? আমাকে ত শীতে ভারি কাঁপিয়ে তুলেছে। কেবল কাল রাত্তিরে কোন্ একটা বদ্ধ জায়গায় নৌকো রেখেছিল, আর সমস্ত পর্দ্দা ফেলেছিল— তাই গরমে জেগে উঠেছিলুম— তার উপরে আবার কানের কাছে একদল লোক সেই এক্‌টা ছুটো রাত্তিরে গান জুড়ে দিলে "কত নিদ্রা দিবে আর উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়ে।" প্রাণপ্রিয়ে যদি কাছাকাছির মধ্যে থাক্‌ত তা হলে বোধ হয় চেলা কাঠের বাড়ি পিটোত। মাঝিরা তাদের ধম্‌কে থামিয়ে দিলে, কিন্তু আমার মাথায় ক্রমাগতই ঐ লাইনটা ঘুরতে লাগল "উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়ে"— মাথার মধ্যে অসুখ কর্ত্তে লাগ্‌ল— শেষকালে পর্দ্দা উঠিয়ে জান্‌লা খুলে শেষ রাত্তিরে একটুখানি ঘুমোতে পাই। তাই আজ কেবল

ঘুম পাচ্চে। টিনের জিনিষ আর মদগুলো কেনই বা আমার জন্মদিন পর্য্যন্ত না থাক্‌বে! সমস্ত প্যাক করাই আছে, এখনো খোলাই হয়নি। তোমার ভাই কলকাতায় এসে কি রকম আছে। তার পড়াশুনোর কি কিছু ঠিক কর্‌চ? মাসকাবারী ক মাসের বেরোলো? আমি হয় ত দিন পনেরো বাদে এখান থেকে যেতে পারব— এখনো বল্‌তে পারিনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[সাহাজাদপুর। ১৮৯১]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ সকালে এ অঞ্চলের একজন প্রধান গণৎকার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সমস্ত সকাল বেলাটা সে আমাকে জ্বালিয়ে গেছে— বেশ গুছিয়ে লিখ্‌তে বসেছিলুম বকে বকে আমাকে কিছুতেই লিখ্‌তে দিলে না। আমার রাশি এবং লগ্ন শুনে কি গুণে বল্লে জান? আমি সুবেশী, সুরূপ, রংটা শাদায় মেশানো শ্যামবর্ণ, খুব ফুট্‌ফুটে গৌর বর্ণ নয়।— আশ্চর্য্য! কি করে গুণে বল্‌তে পারলে বল দেখি? তার পরে বল্লে আমার সঞ্চয়ী বুদ্ধি আছে কিন্তু আমি সঞ্চয় করতে পারব না— খরচ অজস্র করব কিন্তু কৃপণতার অপবাদ হবে— মেজাজটা কিছু রাগী (এটা বোধ হয় আমার তখনকার মুখের ভাবখানা দেখে বলেছিল)। আমার ভার্য্যাটি বেশ ভাল।

আমার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হবে— আমি যাদের উপকার করব তারাই আমার অপকার করবে। ষাট বাষট্টি বৎসরের বেশি বাঁচব না। যদিবা কোন মতে সে বয়স কাটাতে পারি তবু সত্তর কিছুতেই পেরতে পারব না। শুনে ত আমার ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। এই ত সব ব্যাপার। যা হোক তুমি তাই নিয়ে যেন বেশি ভেবো না। এখনো কিছু না হোক ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আমার সংসর্গ পেতে পারবে। ততদিনে সম্পূর্ণ বিরক্ত ধরে না গেলে বাঁচি। আমার ঠিকুজিটা সঙ্গে থাকলে তাকে দেখানো যেতে পারত। সেটা আবার প্রিয়বাবুর কাছে আছে। সে বল্লে বর্ত্তমানে আমার ভাল সময় চল্‌চে— বৃহস্পতির দশা— ফাল্গুন মাসে রাহুর দশা পড়বে। ভাল অবস্থা কাকে বলে তাত ঠিক বুঝতে পারিনে।

রবি

৭

[সাহাজাদপুর। জুন ১৮৯১]

ওঁ

ভাই ছুটি

আচ্ছা, আমি যে তোমাকে এই সাহাজাদপুরের সমস্ত গোয়ালার ঘর মন্থন করে উৎকৃষ্ট মাখনমারা ঘের্ত্ত, সেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম তৎসম্বন্ধে কোন রকম উল্লেখমাত্র যে করলে না তার কারণ কি বল দেখি? আমি দেখ্‌চি অজস্র উপহার পেয়ে পেয়ে তোমার কৃতজ্ঞতা বৃত্তিটা ক্রমেই অসাড় হয়ে আস্‌চে।

প্রতি মাসে নিয়মিত পনেরো সের করে ঘি পাওয়া তোমার এমনি স্বাভাবিক মনে হয়ে গেছে যেন বিয়ের পূর্ব্বে থেকে তোমার সঙ্গে আমার এই রকম কথা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তোমার ভোলার মা আজকাল যখন শয্যাগত তখন এ ঘি বোধ হয় অনেক লোকের উপকারে লাগ্‌চে। ভালই ত। একটা সুবিধা, ভাল ঘি চুরি করে খেয়ে চাকরগুলোর অসুখ করবে না। আমার আম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এবারে মনে হল যেন দু জাতের আম ছিল, একরকমের আম খুব ভাল ছিল— অন্যটাও মন্দ নয় কিন্তু তেমন ভাল না। দুটো একটা পচেও গেছে। যাহোক ঠিক একটি হপ্তা ত চলে গেল। আমার আহার দেখে এখানকার লোকে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। আমি ভাত খাইনে শুনে এরা মনে করে যেন আমি অনাহারে তপস্যা করচি। আটার রুটি যে ভাতের চতুর্গুণ খাদ্য তা এদের কিছুতেই ধারণা হয় না। যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে সেই একবার করে আমার আহারের কথা তুলে আশ্চর্য্য প্রকাশ করে যায়। সাহাজাদপুরময় কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ভাত ছেড়ে দিয়েছি বলে সবাই আমাকে ভারি ধার্ম্মিক মনে করে— আমার কুষ্টিতে লেখা আছে কি না যে বিনা চেষ্টায় আমার যশ এবং আর দুই একটা জিনিষ হবে।

রবি

৮

[সাহাজাদপুর। ২০ জুন ১৮৯১]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ আমার প্রবাস ঠিক একমাস হল। আমি দেখেছি যদি কাজের ভীড় থাকে তা হলে আমি কোন মতে একমাস কাল বিদেশে কাটিয়ে দিতে পারি। তার পর থেকে বাড়ির দিকে মন টানতে থাকে।— কাল সন্ধের সময় এখানে বেশ একটু রীতিমত ঝড়ের মত হয়ে গেছে। বাতাসের গর্জ্জনে অনেকক্ষণ ঘুমোতে দেয়নি। তোমাদের ওখানেও বোধ হয় এ ঝড়টা হয়ে গেছে। কাল দিনের বেলাও খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। নদীর জলও অনেকখানি বেড়ে উঠেছে। শস্যের ক্ষেত সমস্তই জলে ডুবে গেছে— জল আর একফুট বাড়লেই আমাদের বাগানের কাছে আসে। যেদিকে চেয়ে দেখি খানিকটা ডাঙ্গা খানিকটা জল। মেয়েরা আপনার বাড়ির সামনের জলেই বাসন মাজা এবং অন্যান্য নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন করচে। সভ্যতার অনুরোধে শরীর যতখানি কাপড়ে আবৃত থাকা উচিত তার চেয়েও আঙুল চার পাঁচ উপরে কাপড় তুলে মেয়ে পুরুষ সকলেই রাস্তা দিয়ে চলেচে। গর্ম্মিকালে এখানে যেমন জলকষ্ট, বর্ষাকালে ঠিক তার উল্টো। আমাদের তেতালাতেও বোধ হয় বৃষ্টি হলে কতকটা এই রকমের দৃশ্যই দেখা যায়। বারান্দায় যে পরিমাণে জল দাঁড়ায় তাতে বোধ হয় অনায়াসে চৌকাঠের কাছে বসে স্নান বাসন-মাজা প্রভৃতি চলে যায়।

বর্ষাকালে যদি এই উপায় অবলম্বন কর তাহলে তোমার অনেকটা পরিশ্রম বেঁচে যায়। আজকাল তুমি দুবেলা খানিকটা করে ছাতে পায়চারি করে বেড়াচ্চ কি না আমাকে বল দেখি। এবং অন্যান্য সমস্ত নিয়ম পালন হচ্চে কি না, তাও জানাবে। আমার খুব সন্দেহ হচ্চে তুমি সেই কেদারাটার উপর পা ছড়িয়ে বসে একটু একটু করে পা দোলাতে দোলাতে দিবি[্য] আরামে নভেল পড়চ। তোমার যে মাথা ধরত এখন কি রকম আছে?

রবি

৯

[সাহাজাদপুর]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ যদি বিরাহিমপুরের পেস্কার সেখানকার ফটিক মজুমদারের মকদ্দমায় প্রতিবাদীর পক্ষের উকীল বক্তৃতায় আমাদের বিরুদ্ধে কি কি কথা বলেছে বিবৃত করে একখানি চিঠি না লিখ্‌ত তা হলে ডাকে আমার একখানিও চিঠি আস্‌ত না এবং আমি এতক্ষণ বসে বসে ভাবতুম আজ এখনো ডাক এল না বুঝি। তোমাদের মত এত অকৃতজ্ঞ আমি দেখিনি। পাছে তোমাদের চিঠি পেতে একদিন দেরি হয় বলে কোথাও যাত্রা করবার সময় আমি একদিনে উপরি উপরি তিনটে চিঠি

লিখেচি। কিন্তু আজ থেকে নিয়ম করলুম চিঠির উত্তর না পেলে আমি চিঠি লিখব না। এ রকম করে চিঠি লিখে লিখে কেবল তোমাদের অভ্যাস খারাপ করে দেওয়া হয়— এতে তোমাদের মনেও একটুখানি কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয় না। তুমি যদি হপ্তায় নিয়মিত দুখানা করে চিঠিও লিখ্‌তে তা হলেও আমি যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করতুম। এখন আমার ক্রমশঃ বিশ্বাস হয়ে আস্‌চে তোমার কাছে আমার চিঠির কোন মূল্য নেই এবং তুমি আমাকে দু ছত্র চিঠি লিখ্‌তে কিছুমাত্র কেয়ার কর না। আমি মূর্খ কেন যে মনে করি তোমাকে রোজ চিঠি লিখ্‌লে তুমি হয়ত একটু খানি খুসি হবে এবং না লিখ্‌লে হয়ত চিন্তিত হতে পার, তা ভগবান্ জানেন। বোধ হয় ওটা একটা অহঙ্কার। কিন্তু এ গর্ব্বটুকু আর ত রাখতে পারলুম না। এখন থেকে বিসর্জ্জন দেওয়া যাক্। আজ সন্ধে বেলায় শ্রান্ত শরীরে বসে বসে এই রকম লিখ্‌লুম, আবার হয়ত কাল দিনের বেলায় অনুতাপ হবে, মনে হবে পৃথিবীতে পরের কাজ নিয়ে পরকে ভর্ৎসনা করার চেয়ে নিজের কাজ নিজে করে যাওয়াই ভাল। কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই পরের ত্রুটি নিয়ে খিটিমিটি করা আমার স্বভাব এবং তোমার অদৃষ্টক্রমে তোমাকে চিরজীবন এটা সহ্য করতে হবে। ভৎসনাটা প্রায় চেঁচিয়ে করি আর অনুতাপটা মনে মনে করি, কেউ শুন্‌তে পায় না।

রবি

মৃণালিনী দেবী ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী

ক্রোড়ে প্রথমা কন্যা বেলা

১০

[সাহাজাদপুর। ২৬ জুন ১৮৯২]

ওঁ

ভাই ছুটি—

এখানে কাল থেকে কেমন একটু ঝোড়ো রকমের হয়ে আস্‌চে— এলোমেলো বাতাস বচ্চে, থেকে থেকে বৃষ্টি পড়চে, খুব মেঘ করে রয়েচে। গণৎকার যে বলেচে ২৭ জুন অর্থাৎ কাল একটা প্রলয় ঝড় হবার কথা, সেটা মনে একটু একটু বিশ্বাস হচ্চে। আমার ইচ্ছে করচে কালকের দিনটা তোমরা তেতালা থেকে নেবে এসে দোতলায় হলের ঘরে যাপন কর— কিন্তু আমার এ চিঠিটা তোমরা পর্শু পাবে— যদি সত্যিই কাল ঝড় হয় আমার এ পরামর্শ কোন কাজে লাগ্‌বে না। তেমন ঝড়ের উপক্রম দেখ্‌লে তোমরা কি আপনিই বুদ্ধি করে নীচে আস্‌বে না? যা হোক্‌, দৈবের উপর নির্ভর করে থাকা যাক্‌। তোমার কালকের একটা চিঠি পেয়ে আমার মন একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমরা যদি সকল অবস্থাতেই দৃঢ় বলের সঙ্গে সরল পথে সত্য পথে চলি তা হলে অন্যের অসাধু ব্যবহারে মনের অশান্তি হবার কোন দরকার নেই— বোধ হয় একটু চেষ্টা করলেই মনটাকে তেমন করে তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। একলা বসে বসে সঙ্কল্প করেছি আমি সেই রকম চেষ্টা করব— অবিচলিত ভাবে আপনার কর্ত্তব্য করে যাব— তার পরে যে যা বলে যে যা করে কিছুতেই তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হব না— কতদূর কৃতকার্য্য হতে পারব জানিনে। প্রতিদিন নিরলস

হয়ে নিজের সমস্ত কাজগুলি নিজের হাতে সম্পূর্ণরূপে সমাধা করলে এ রকম নিজের প্রতি এবং চারদিকের প্রতি অসন্তোষ জন্মাতে পায় না— যেখানেই পড়া যায় সেখানেই বেশ প্রফুল্ল সন্তুষ্টভাবে আপনার নিত্য কাজ করে কাটানো যেতে পারে। মনে যদি কোন কারণে একটা অসন্তোষ এসে পড়ে সেটাকে যতই পোষণ করবে ততই সে অন্যায় রূপে বেড়ে উঠ্‌তে থাকে— সেটা যে কিছুই নয় এই রকম ভাব্‌তে চেষ্টা করা উচিত— তার যতটুকু প্রতিকার করা আমার সাধ্য তা অবশ্য করব— যতটুকু অসাধ্য তা ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা স্মরণ করে অপরাজিত চিত্তে বহন করবার চেষ্টা করব। পৃথিবীতে এ ছাড়া যথার্থ সুখী হবার আর কোন উপায় নেই।— আমিও মনে করেছিলুম শিলাইদহের বাড়ি করবার ভার নীতুর উপর দেব। এবারে ফিরে গিয়ে তার একটা স্থির করা যাবে। তোমার বইয়ের লিষ্টের মধ্যে যতদূর মনে পড়চে দুখানা বই কম দেখ্‌চি— রামমোহন রায় এবং মন্ত্রী অভিষেক— প্রথমটা সমাজে পাওয়া যায় দ্বিতীয়টা তেতালাতেই পাবে। পদরত্নাবলীও দিতে পার।

রবি

রবিবার

১১

[শিলাইদহ। ২০ জুলাই ১৮৯২]

ওঁ

ভাই ছুটি—

আজ আর একটু হলেই আমার দফা নিকেশ হয়েছিল। তরীর সঙ্গে দেহতরী আর একটু হলেই ডুবেছিল। আজ সকালে পান্টি থেকে পাল তুলে আস্‌ছিলুম— গোরাই ব্রিজের নীচে এসে আমাদের বোটের মাস্তুল ব্রিজে আট্‌কে গেল— সে ভয়ানক ব্যাপার— একদিকে স্রোতে বোটকে ঠেল্‌চে আর এক দিকে মাস্তুল ব্রিজে বেধে গেছে— মড়মড় মড়মড় শব্দে মাস্তুল হেল্‌তে লাগ্‌ল একটা মহা সর্ব্বনাশ হবার উপক্রম হল এমন সময় একটা খেয়া নৌকো এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল এবং বোটের কাছি নিয়ে তুজন মাল্লা জলে ঝাঁপিয়ে সাঁৎরে ডাঙ্গায় গিয়ে টান্‌তে লাগ্‌ল— ভাগ্যি সেই নৌকো এবং ডাঙ্গায় অনেক লোক সেই সময় উপস্থিত ছিল তাই আমরা উদ্ধার পেলুম, নইলে আমাদের বাঁচবার কোন উপায় ছিল না— ব্রিজের নীচে জলের তোড় খুব ভয়ানক— জানিনে, আমি সাঁৎরে উঠতে পারতুম কি না কিন্তু বোট নিশ্চয় ডুব্‌ত। এ যাত্রায় তু তিনবার এই রকম বিপদ ঘট্‌ল। পান্টিতে যেতে একবার বটগাছে বোটের মাস্তুল বেধে গিয়েছিল সেও কতকটা এই রকম বিপদ— কুষ্টিয়ার ঘাটে মাস্তুল তুল্‌তে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে মাস্তুল পড়ে গিয়েছিল আর একটু হলেই ফুলচাঁদ মারা গিয়েছিল।— মাঝিরা বল্‌চে এবার অযাত্রা হয়েচে।— খুব

ঘন মেঘ করে এসেচে— সমস্ত নদী তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে— সুন্দর দেখ্‌তে হয়েচে— কিন্তু দেখ্‌বার সময় নেই— দুপুর বাজে— এইবেলা নাইতে যাই। বর্ষাকালে নদীতে ভ্রমণ না করলে নদীর শোভা দেখা যায় না— কিন্তু বর্ষাকালে জলে বেড়ানো প্রায় ঘটে ওঠে না। এবারে ত হল।— যাই নাইতে যাই।

রবি

১২

[শিলাইদহ। নদীপথে। ১৮৯২]

ওঁ

ভাই ছুটি—

আজ শিলাইদহ ছাড়বার আগেই তোমার চিঠিটা পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। তোমরা আসচ এক হিসাবে আমার ভালোই হয়েচে, নইলে কলকাতায় ফিরতে আমার মন যেত না, এবং কলকাতায় ফিরেও আমার অসহ্য বোধ হত। তা ছাড়া আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই, সেইজন্যে তোমাদের কাছে পাবার জন্যে আমার প্রায়ই মনে মনে ইচ্ছে করত। কিন্তু আমি বেশ জানি যতদিন তোমরা সোলাপুরে থাক্‌বে ততদিন তোমাদের পক্ষে ভাল হবে। ছেলেরা অনেকটা শুধ্‌রে এবং শিখে এবং ভাল হয়ে আস্‌বে এই রকম আমি খুব আশা

করে ছিলুম। যাই হোক্ সংসারের সমস্তই ত নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়। যে অবস্থার মধ্যে অগত্যা থাকতেই হবে তার মধ্যে যতটা পারা যায় প্রাণপণে নিজের কর্ত্তব্য করে যেতে হবে—তারই মধ্যে যতটা ভাল করা যায় তা ছাড়া মানুষ আর কি করতে পারে বল। অসন্তোষকে মনের মধ্যে পালন কোরো না ছোট বৌ— ওতে মন্দ বই ভাল হয় না। প্রফুল্ল মুখে সন্তুষ্ট চিত্তে অথচ একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সংসারের ভিতর দিয়ে যেতে হবে— আমি নিজে ভারি অসন্তুষ্ট স্বভাব, সেই জন্যে আমি অনেক অনর্থক কষ্ট পাই— কিন্তু তোমাদের মনে অনেকখানি প্রফুল্লতা থাকা ভারি আবশ্যক। নইলে সংসার বড় অন্ধকার হয়ে আসে। যা চেষ্টা করবার তা যত দূর সাধ্য করব— কিন্তু তুমি মনে মনে অসুখী অসন্তুষ্ট হয়ে থেকো না ছুটি। জান ত ভাই আমার খুঁৎখুঁতে স্বভাব, আমার নিজেকে ঠাণ্ডা করতে যে কত সময় নির্জ্জনে বসে নিজেকে কত বোঝাতে হয় তা তুমি জান না— তুমি আমার সেই খুঁৎখুঁতে ভাবটা দূর করে দিয়ো, কিন্তু তুমি আবার তাতে যোগ দিয়ো না। যদি তোমরা ইতিমধ্যে ছেড়ে থাকো তা হলে ত এবার কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হবে— চেষ্টা করব উড়িষ্যায় যদি আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। সে জায়গাটা ভারি স্বাস্থ্যকর। আমি বাবামশায়কে আমার ইচ্ছে কতকটা জানিয়ে রেখেচি তিনিও কতকটা বুঝেচেন— আর তুই একবার বল্লে কিছু ফল হতেও পারে— কিন্তু আগে থাকৃতে বেশি আশা করে বসা কিছু না। আমার মনে হচ্চে হতে করতে এ চিঠিটাও

তুমি সোলাপুর অঞ্চলে পাবে। আজ যাব কাল যাব করে নির্দ্দিষ্ট দিনের পরেও নিদেন তোমাদের দিন আষ্টেক দশ কেটে যাবে। দেখা যাক্। সমস্ত দিন বোট চল্‌চে— সন্ধে হয়ে গেছে কিন্তু এখনো ত পাবনায় পৌঁছলুম না। সেখানে গিয়ে আবার ক্রোশ দেড়েক পাল্কীতে করে যেতে হবে।

রবি

সোমবার

১৩

[কটক হইতে পুরীর পথে

১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ এগারোটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরতে হবে। আজ রাত্তির পথের মধ্যে একটা ডাক বাঙ্গলায় কাটাতে হবে, তারপরে কাল বোধ হয় সন্ধের মধ্যে পুরীতে গিয়ে পৌঁছতে পারব। Mrs. Gupta এবং তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাচ্চেন, সে জন্যে তাঁদের বিস্তর জিনিষ পত্র বোঁচ্‌কাবুঁচ্‌কি গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে চলেচে। বিহারীবাবু ত নানা রকম বন্দোবস্ত করতে করতে এই তিন চার দিন একেবারে ক্ষেপে যাবার যো হয়েচেন। Mrs. Gupta ভারি নিরুপায় গোছের

মেয়ে— তিনি কিছুই গুছিয়ে গাছিয়ে করেকর্ম্মে নিতে পারেন না— তিনি বেশ ঠাণ্ডা হয়ে চুপচাপ করে বসে থাকেন— বলেন, আমি পারিনে, আমার মাথায় কিছু আসে না। বিহারীবাবুর অনেকটা আমার মত ধাত আছে দেখ্‌লুম। তিনি সকল বিষয়েই ভারি ব্যস্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই যে ক দিনের জন্যে পুরীতে যাচ্চেন, মানুষ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতে হলেও এত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেনা। কেবল তিনি আমার মত খুঁৎখুঁৎ খিট্‌খিট্‌ করেন না— সেটা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে একটা মহা সুবিধে। সমস্ত খুব চুপচাপ প্রশান্ত ভাবে সহ্য করতে পারেন। এ রকম স্বামী আমার বোধ হয় পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। বিহারীবাবু ভারি গৃহস্থ প্রকৃতির লোক— ছেলে পুলেদের খুব ভালবাসেন, আমার দেখ্‌তে বেশ লাগে। আমাদের এমন যত্ন করেন— ঠিক যেন ঘরের লোকের মত— খুব যে বেশি আদর দেখিয়ে ব্যস্ত করে তোলা তা নয়— আমরা আমাদের ঘরে সমস্ত দিন যা-খুসী তাই করতে সময় পাই। যে যত্নটুকু করেন বেশ সহজ স্বাভাবিকভাবে। কিচ্ছু বাড়াবাড়ি নেই। এমনকি বলুকেও অনেকটা বাগিয়ে আন্‌তে পেরেচেন— সে বেচারা যদিও এখনো ক্রমাগত মাথা নীচু করে লজ্জায় লাল হয়ে হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া ত একরকম বন্ধ করেচে। ওঁরা যা খেতে বলেন তাতেই মাথা নাড়ে। ভাগ্যি ওঁরা দুজনে মিলে অনেক পীড়াপীড়ী করেন তাই মুখে দুটি অন্ন ওঠে। নইলে এতদিনে শুকিয়ে যেত। পথের মধ্যে যদি দুদিন চিঠি লিখ্‌তে না পারি ত কিছু ভেবো

না, এবং এ কথা মনে রেখো যে কটক থেকে যত দিনে চিঠি পাও পুরি থেকে তার চেয়ে আরো দুদিন দেরি হয়— সে আরো দূরে। তা হলে তিন চারদিন চিঠি না পেতেও পার—

রবি

১৪

[শিলাইদহ। জুন-জুলাই ১৮৯৩]

ওঁ

ভাই ছুটি

কাল ডিকিন্সন্‌দের বাড়ি থেকে আবার তাগিদ্ দিয়ে আমার কাছে এক একশো বিরাশি টাকার বিল এবং চিঠি এসেছে। আবার আমাকে সত্যর শরণাপন্ন হতে হল। তা হলে তার কাছে আমার ন শো টাকার ধার থাক্‌ল। সে কি তোমাকে চার শো টাকা দিয়েছে? আমাকে ত এখনো সে সম্বন্ধে কিছুই লেখেনি। আজকের বিবির চিঠিতে তোমাদের কতকটা বিবরণ পেলুম। সে লিখেছে তোমরা প্রায়ই সেখানে যাও— এবং আমার ক্ষুদ্রতম কন্যাটি মেজবোঠানের কোলে পড়ে পড়ে নানা বিধ অঙ্গভঙ্গী এবং অস্ফুট কলধ্বনি প্রকাশ করে থাকে। তাকে আমার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। আমি যদি আষাঢ় মাস মফস্বলে কাটিয়ে যাই তা হলে ততদিনে তার অনেক পরিবর্ত্তন এবং অনেক রকম নতুন বিদ্যে শিক্ষা হবে। বেলির সঙ্গে খোকা কি গান শিখ্‌চে না? তার গলা কি রকম

ফুট্‌চে ? কেবল সা রে গা মা না শিখিয়ে তার সঙ্গে একটা কিছু গান ধরানো ভাল— তা হলে ওদের শিখ্‌তে ভাল লাগ্‌বে— নইলে ক্রমেই বিরক্ত ধরে যাবে। মনে আছে ছেলেবেলায় যখন বিষ্ণুর কাছে গান শিখ্‌তুম তখন সা রে গা মা শিখ্‌তে ভারি বিরক্ত বোধ হত। যে দিন সে নতুন কোন গান শেখানো ধরাত সেই দিন ভারি খুসি হতুম। তুমিও তোমার পুত্রকন্যাদের সঙ্গে একত্র বসে সা রে গা মা সাধ্‌তে আরম্ভ করে দাও না— তার পরে বর্ষার দিনে আমি যখন ফিরে যাব তখন স্বামী স্ত্রীতে দুজনে মিলে বাদ্‌লায় খুব সঙ্গীতালোচনা করা যাবে। কি বল ? বিদ্যেভূষণ আজকাল তোমার কাজকর্ম্ম কি রকম করচে ? ইদানীং তাকে ধম্‌কে দেওয়ার পর কি তার স্বভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে— বেচারার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে অনেক দিন পরে সম্মিলন হয়েছে সেটা মনে রেখো— তোমার মার খবর কি ?

রবি

১৫

[৭ জুলাই ১৮৯৩]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ আহারান্তে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে তোমাকে একখানি চিঠি লিখেছি তারপরেও আবার খানিকক্ষণ ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে গড়াতে গড়াতে সাধনার কাজ করেছি। তারপরে যখন এখানকার

প্রধান কর্ম্মচারীরা বড় বড় কাগজের তাড়া নিয়ে এসে প্রণাম করে মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন তখন আমার ঘুমের ঘোর আমার সুখের স্বপন একেবারে ছুটে গেল। একবার মনে মনে ভাবলুম, যদি এদের মধ্যে কেউ হঠাৎ সুর করে গেয়ে ওঠে—

"ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর।"

তা হলে ও গানটা বোধ হয় মায়ার খেলার দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে একেবারে উঠিয়ে দিই। কিন্তু সে রকম সুর করে গান গাবার ভাব কারো দেখ্‌লুম না। দুই একজনের একটু খানি কাঁদুনির সুর ছিল কিন্তু তাদের বক্তব্য বিষয়টা ঘুমের ঘোর প্রেমের ডোর নিয়ে নয়— তারা বেতন বৃদ্ধি চায়। তাদের অনেকগুলি ছেলেপুলে, হজুরের শ্রীচরণ ছাড়া তাদের আর কোন ভরসা নেই, হজুর তাদের মাতা এবং পিতা। এ ছাড়া কতকগুলি সাবেক ইজারাদারের নামে বাকি খাজনার ডিক্রি করা হয়েচে তারা সুদ খরচা মাপ নিয়ে কিস্তিবন্দী করে টাকা দিতে চায় এবং তাদের দেনার মধ্যে যে সমস্ত ওজর আছে তারও একটা সদ্বিচার প্রার্থনা করে। এর মধ্যে করুণরস এবং অশ্রুজল যথেষ্ট আছে, অনেকে হয় ত বাড়ি ঘর দোর নিলেম করে সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছে কিন্তু এতে সুর বসিয়ে অপেরা হবার যো নেই— কিন্তু নলিন নয়নের কোণে একটুখানি ছল্‌ছল্ করে আসুক দেখি অমনি কবির কবিতা গাইয়ের গান বাজিয়ের বাজনা সমস্ত ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌বে, অমনি দর্শক শ্রোতা এবং পাঠকের বক্ষস্থল অশ্রুজলে ভেসে যাবে। এম্‌নি এই সংসার।

সমুদ্রতীর এবং সমুদ্রতরঙ্গের উপর যখন কবিতা লিখ্‌চি তখন আর কাঠা বিঘের জ্ঞান থাকে না, তখন অনন্ত সমুদ্র অনন্ত তীর চোদ্দ অক্ষরের মধ্যে। আর সেই সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট বাঙ্গ্‌লা বানাতে যাও, তখন এঞ্জিনিয়র কণ্ট্রাক্টর এষ্টিমেট্‌ চিন্তা পরামর্শ— ধার এবং টোয়েল্‌ভ্‌ পার্সেণ্ট্‌ সুদ— তার উপরে আবার কবির স্ত্রীর পছন্দ হয় না, লোক্‌সান বোধ হয়— স্বামীর মস্তিষ্কের অবস্থার উপর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কবিত্ব এবং সংসার এই দুটোর মধ্যে বনিবনাও আর কিছুতে হয়ে উঠ্‌ল না দেখচি। কবিত্বে এক পয়সা খরচ নেই (যদি না বই ছাপাতে যাই) আর সংসারটাতে পদে পদে ব্যয়বাহুল্য এবং তর্কবিতর্ক। এই রকম নানা চিন্তা করচি এবং খালের মধ্যে দিয়ে বোট টেনে নিয়ে যাচ্চে— আকাশে ঘননীল মেঘ করেচে— ভিজে বাদ্‌লার বাতাস দিয়েছে, সূর্য্য প্রায় অস্তমিত— পিঠে একখানি শাল চাপিয়ে যোড়াসাঁকোর ছাত আমার সেই দুটো লম্বা কেদারা এবং সাঁৎলাভাজার কথা এক একবার মনে করচি। সাঁৎলা ভাজা চুলোয় যাক্‌ রাত্রে রীতিমত আহার জুট্‌লে বাঁচি। গোফুর মিঞা নৌকোর পিছন দিকে একটা ছোট্ট উনুন জ্বালিয়ে কি একটা রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত আছে মাঝে মাঝে ঘিয়ে ভাজার চিড়্‌বিড়্‌ চিড়্‌বিড়্‌ শব্দ হচ্চে— এবং নাসারন্ধ্রে একটা সুস্বাদু গন্ধও আস্‌চে কিন্তু এক পস্‌লা বৃষ্টি এলেই সমস্ত মাটি। তোমাদের সকলকে আমার হামি।

রবি

শুক্রবার

১৬

[শিলাইদহ। জুন ১৮৯৮]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ ঢাকা থেকে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলুম। আমি তাহলে একবার শীঘ্র কালিগ্রামের কাজ সেরে কলকাতায় গিয়ে যথোচিত বন্দোবস্ত করে আসব। কিন্তু ভাই, তুমি অনর্থক মনকে পীড়িত কোরো না। শান্ত স্থির সন্তুষ্ট চিত্তে সমস্ত ঘটনাকে বরণ করে নেবার চেষ্টা কর। এই একমাত্র চেষ্টা আমি সর্ব্বদাই মনে বহন করি এবং জীবনে পরিণত করবার সাধনা করি। সব সময় সিদ্ধিলাভ করতে পারিনে— কিন্তু তোমরাও যদি মনের এই শান্তিটি রক্ষা করতে পারতে তাহলে বোধ হয় পরস্পরের চেষ্টায় সবল হয়ে আমিও সন্তোষের শান্তি লাভ করতে পারতুম। অবশ্য তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক অল্প, জীবনের সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতা অনেকটা সীমাবদ্ধ, এবং তোমার স্বভাব একহিসাবে আমার চেয়ে সহজেই শান্ত সংযত এবং ধৈর্য্যশীল। সেইজন্যে সর্ব্বপ্রকার ক্ষোভ হতে মনকে একান্ত যত্নে রক্ষা করবার প্রয়োজন তোমার অনেক কম। কিন্তু সকলেরই জীবনে বড় বড় সঙ্কটের সময় কোন না কোন কালে আসেই— ধৈর্য্যের সাধনা, সন্তোষের অভ্যাস কাজে লাগেই। তখন মনে হয় প্রতিদিনের যে সকল ছোট খাট ক্ষতি ও বিঘ্ন, সামান্য আঘাত ও বেদনা নিয়ে আমরা মনকে নিয়তই ক্ষুণ্ণ ও বিচলিত করে রেখেছি সে সব কিছুই

নয়। ভালবাস্‌ব এবং ভাল কর্‌ব— এবং পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সুমিষ্ট প্রসন্নভাবে সাধন করব— এর উপরে যখন যা ঘটে ঘটুক্‌। জীবনও বেশি দিনের নয় এবং সুখদুঃখও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। স্বার্থহানি, ক্ষতি, বঞ্চনা— এ সব জিনিষকে লঘুভাবে নেওয়া শক্ত, কিন্তু না নিলে জীবনের ভার ক্রমেই অসহ্য হতে থাকে এবং মনের উন্নত আদর্শকে অটল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই যদি না হয়, যদি দিনের পর দিন অসন্তোষে অশান্তিতে, অবস্থার ছোট ছোট প্রতিকূলতার সঙ্গে অহরহ সংঘর্ষেই জীবন কাটিয়ে দিই— তা হলে জীবন একেবারেই ব্যর্থ। বৃহৎ শান্তি, উদার বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থ প্রীতি, নিষ্কাম কর্ম্ম— এই হল জীবনের সফলতা। যদি তুমি আপনাতে আপনি শান্তি পাও এবং চারদিককে সান্ত্বনা দান করতে পার, তাহলে তোমার জীবন সম্রাজ্ঞীর চেয়ে সার্থক। ভাই ছুটি— মনকে যথেচ্ছা খুঁৎখুঁৎ করতে দিলেই সে আপনাকে আপনি ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। আমাদের অধিকাংশ দুঃখই স্বেচ্ছাকৃত। আমি তোমাকে বড় বড় কথায় বক্তৃতা দিতে বসেছি বলে তুমি আমার উপর রাগ কোরো না। তুমি জান না অন্তরের কি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমি এ কথাগুলি বল্‌চি। তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং সহজ সহায়তার একটি সুদৃঢ় বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় হয়ে আসে, যাতে সেই নির্ম্মল শান্তি এবং সুখই সংসারের আর সকলের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, যাতে তার কাছে প্রতিদিনের সমস্ত দুঃখ নৈরাশ্য ক্ষুদ্র হয়ে যায়— আজ কাল এই আমার চোখের কাছে একটা প্রলোভনের মত

জাগ্রত হয়ে আছে। স্ত্রীপুরুষের অল্প বয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছ্বসিত মত্ততা আছে কিন্তু এ বোধ হয় তুমি তোমার নিজের জীবনের থেকেও অনুভব করতে পারচ— বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গদোলার মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়— নিজের সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশি বাইরে চলে যায়— সেইজন্যেই সংসার বৃদ্ধি হলে এক হিসাবে সংসারের নির্জ্জনতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠতার বন্ধনগুলি চারদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে। মানুষের আত্মার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই, যখনি তাকে খুব কাছে নিয়ে এসে দেখা যায়, যখনি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি পরিচয় হয় তখনি যথার্থ ভালবাসার প্রথম সূত্রপাত হয়। তখন কোন মোহ থাকে না, কেউ কাউকে দেবতা বলে মনে করবার কোন দরকার হয় না, মিলনে ও বিচ্ছেদে মত্ততার ঝড় বয়ে যায় না— কিন্তু দূরে নিকটে সম্পদে বিপদে অভাবে এবং ঐশ্বর্য্যে একটি নিঃসংশয় নির্ভরের একটি সহজ আনন্দের নির্ম্মল আলোক পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। আমি জানি তুমি আমার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ, এও নিশ্চয় জানি যে আমারই জন্যে দুঃখ পেয়েছ বলে হয়ত একদিন তার থেকে তুমি একটি উদার আনন্দ পাবে। ভালবাসায় মার্জ্জনা এবং দুঃখ স্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছাপূরণ ও আত্মপরিতৃপ্তিতে সে সুখ নেই। আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক্, আমাদের চতুর্দ্দিক্ প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক্, আমাদের

সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক্, আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক্,— এবং যদি বা ছেলেমেয়েরাও আমাদের এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশঃ দূরে চলে যায় আমরা দুজনে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসারক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি। সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আস্‌তে এত উৎসুক হয়েছি— সেখানে কোনমতেই লাভক্ষতি আত্মপরকে ভোলবার যো নেই— সেখানে ছোটখাট বিষয়ের দ্বারা সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ হয়ে শেষ কালে জীবনের উদার উদ্দেশ্যকে সহস্র ভাগে খণ্ডীকৃত করতেই হবে। এখানে অল্পকেই যথেষ্ট মনে হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয় না। এখানে এই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা তত শক্ত নয়, যে—

সুখং বা যদিবা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ং
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা।

তোমার রবি

প্রমথ সুরেন এবং প্রমথদের একটি গুজরাটী বন্ধু শিলাইদহে আছে।

১৭

[কলকাতা। ২৮ অগস্ট ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই ছুটি

নীতুরা পরের রোগদুঃখশোকতাপ সহ্য করতে পারে না—সে ওদের স্বভাব। সেজন্যে তুমি বিরক্ত হয়ে কি করবে। নবোঠানের এক ছেলে, সংসারের একমাত্র বন্ধন নষ্ট হয়েছে তবু তিনি টাকাকড়ি কেনাবেচা নিয়ে দিনরাত্রি যে রকম ব্যাপৃত হয়ে আছেন তাই দেখে সকলেই আশ্চর্য্য এবং বিরক্ত হয়ে গেছে — কিন্তু আমি মনুষ্যচরিত্রের বৈচিত্র্য আলোচনা করে সেটা শান্তভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করচি— একএকসময় ধিক্কার হয় কিন্তু সেটা আমি কাটিয়ে উঠ্‌তে চাই। আমাদের বাইরে কে কি রকম ব্যবহার করচে সেটাকে নির্লিপ্তভাবে সুদূরভাবে দেখ্‌তে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের শোকদুঃখ, বিরাগ অনুরাগ, ভাললাগা না লাগা, ক্ষুধাতৃষ্ণা, সংসারের কাজকর্ম্ম, সমস্তই আমাদের বাইরে ;— আমাদের যথার্থ "আমি" এর মধ্যে নেই— এই বাইরের জিনিষকে বাইরের মত করে দেখ্‌তে পারলে তবেই আমাদের সাধনা সম্পূর্ণ হয়— সে খুব শক্ত বটে কিন্তু পদে পদে সেইটে মনে রেখে দেওয়া চাই। যখনি কাউকে খারাপ লাগে, যখনি কোন ঘটনায় মনে আঘাত পাওয়া যায় তখনি আপনাকে আপনার অমরত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া চাই। একদিন রাত্রে বৈঠকখানায় ঘুমচ্ছিলুম সেই

অবস্থায় আমার পায়ে বিছে কামড়ায়— যখন খুব যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল আমি আমার সেই কষ্টকে, আমার দেহকে আমার আপনার থেকে বাইরের জিনিষ বলে অনুভব করতে চেষ্টা করলুম— ডাক্তার যেমন অন্য রোগীর রোগযন্ত্রণা দেখে, আমি তেমনি করে আমার পায়ের কষ্ট দেখ্‌তে লাগ্‌লুম— আশ্চর্য্য ফল হল— শরীরে কষ্ট হতে লাগ্‌ল অথচ সেটা আমার মনকে এত কম ক্লিষ্ট করলে যে আমি সেই যন্ত্রণা নিয়ে ঘুমতে পারলুম। তার থেকে আমি যেন মুক্তির একটা নতুন পথ পেলুম। এখন আমি সুখদুঃখকে আমার বাইরের জিনিষ এই ক্ষণিক পৃথিবীর জিনিষ বলে অনেকসময় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারি— তার মত শান্তি ও সান্ত্বনার উপায় আর নেই। কিন্তু বারম্বার পদে পদে এইটেকে মনে এনে সকল রকমের অসহিষ্ণুতা থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা চাই— মাঝে মাঝে ব্যর্থ হয়েও হতাশ হলে হবেনা— ক্ষণিক সংসারের দ্বারা অমর আত্মার শান্তিকে কোনমতেই নষ্ট হতে দিলে চল্‌বে না— কারণ, এমন লোকসান আর কিছুই নেই— এ যেন দুপয়সার জন্যে লাখটাকা খোয়ানো। গীতায় আছে— লোকে যাকে উদ্বেজিত করতে পারে না এবং লোককে যে উদ্বেজিত করে না— যে হর্ষ বিষাদ ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত সেই আমার প্রিয়।

কাল মঙ্গলবারে বলুর শ্রাদ্ধ। তার পরে কর্ম্ম শেষ করে যেতে এ সপ্তাহ নিশ্চয়ই চলে যাবে। এর আর কোন উপায় নেই। নগেন্দ্র ত ইতিমধ্যে তার যশোরের কাজ শেষ করে

ফিরে আস্‌তে পারে। কিন্তু যথাসম্ভব সত্বর ফিরে আসা চাই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রবি

১৮

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ আমার যাওয়া হয় নি সে খবর তুমি বেলার চিঠিতে পেয়েছ। বাড়িতে রয়ে গেলুম— ডাকের সময় ডাক এল— খান তিনেক চিঠি এল— অথচ তোমার চিঠি পাওয়া গেল না। যদিও আশা করিনি তবু মনে করেছিলুম যদি হিসাবের ভুল করে দৈবাৎ চিঠি লিখে থাক। দূরে থাকার একটা প্রধান সুখ হচ্ছে চিঠি— দেখাশোনার সুখের চেয়েও তার একটু বিশেষত্ব আছে। জিনিষটি অল্প বলে তার দামও বেশী— দুটো চারটে কথাকে সম্পূর্ণ হাতে পাওয়া যায়, তাকে ধরে রাখা যায়, তার মধ্যে যতটুকু যা আছে সেটা নিঃশেষ করে পাওয়া যেতে পারে। দেখাশোনার অনেক কথাবার্ত্তা ভেসে চলে যায়— যত খুসি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলেই তার প্রত্যেক কথাটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় না। বাস্তবিক মানুষে মানুষে দেখাশোনার পরিচয় থেকে চিঠির পরিচয় একটু স্বতন্ত্র— তার মধ্যে একরকমের নিবিড়তা

গভীরতা একপ্রকার বিশেষ আনন্দ আছে। তোমার কি তাই মনে হয়না?[১]

১ এই চিঠির অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই।

১৯

[কলকাতা। নবেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

তুমি করছ কি? যদি নিজের দুর্ভাবনার কাছে তুমি এমন করে আত্মসমর্পণ কর তা হলে এ সংসারে তোমার কি গতি হবে বল দেখি? বেঁচে থাকতে গেলেই মৃত্যু কতবার আমাদের দ্বারে এসে কত জায়গায় আঘাত করবে— মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা ত নেই— শোকের বিপদের মুখে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বন্ধু জেনে যদি নির্ভর করতে না শেখ তাহলে তোমার শোকের অন্ত নেই।

নীতু ভাল আছে এবং ক্রমশই ভালর দিকে যাচ্চে। ক'দিন একজন ডাক্তার সমস্ত রাত আমাদের সঙ্গে থেকে ঔষধপত্র দিত— কাল তার দরকার ছিলনা বলে সে আসে নি— সুতরাং সমস্ত রাতটা একলা আমার ঘাড়েই পড়েছিল। এখন তার জ্বর ৯৯°, কাশী সরল, হাঁপানি অনেক কম, নাড়ী সবল, সুতরাং আশা করবার সময় এসেছে— কিন্তু যখন নিশ্চয় কোন কথা বলা যায় না তখন সকল অবস্থার জন্যে প্রস্তুত

থাকাই উচিত। আজ থেকে ডাক্তার কেবল ছু বেলা আস্‌বেন। এ ক'দিন চারবার করে ডাকৃতে হচ্ছিল তা ছাড়া রাত্রে একজন হাজির থাকত। তুমি কেবল শোকেই শ্রান্ত, আমি কর্ম্মে অবসন্ন। আমি আজকাল মৃত্যুর কোন মূর্ত্তিকেই তেমন ভয় করি নে কিন্তু তোমার জন্যে আমার ভাবনা হয়— তোমার মত অমন সর্ব্বসহায়বিহীন হতাশ্বাস গতাশ্রয় মন আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বলে বোধ হয়।

রবি

২০

[কলকাতা। ডিসেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

ছেলেদের জন্যে সর্ব্বদা আমার মনের মধ্যে যে একটা উদ্বেগ থাকে সেটা আমি তাড়াবার চেষ্টা করি। ওরা যাতে ভাল হয় ভাল শিক্ষা পায় আমাদের সাধ্যানুসারে সেটা করা উচিত, কিন্তু তাই নিয়ে মনকে উৎকণ্ঠিত করে রাখা ভুল। ওরা ভাল মন্দ মাঝারি নানা রকমের হয়ে আপন আপন জীবনের কাজ করে যাবে— ওরা আমাদের সন্তান বটে তবু ওরা স্বতন্ত্র—ওদের সুখদুঃখ পাপপুণ্য কাজকর্ম্ম নিয়ে যে পথে অনন্তকাল ধরে চলে যাবে সে পথের উপর আমাদের কোন

কর্ত্তৃত্ব নেই— আমরা কেবল কর্ত্তব্য পালন করব কিন্তু তার ফলের জন্যে কাতরভাবে সস্পৃহভাবে অপেক্ষা করবনা,— ওরা যে রকম মানুষ হয়ে দাঁড়াবে সে ঈশ্বরের হাতে— আমরা সেজন্য মনে মনে কোনরকম অতিরিক্ত আশা রাখ্‌বনা। আমার ছেলের উপর আমার যে মমতা এবং সে সব চেয়ে ভাল হবে বলে আমার যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা সেটা অনেকটা অহঙ্কার থেকে হয়। আমার ছেলের সম্বন্ধে বেশি করে প্রত্যাশা করবার কোন অধিকার আমার নেই। কত লোকের ছেলে যে কত মন্দ অবস্থায় পড়ে, আমরা তার জন্যে কতটুকুই বা ব্যথিত হই? সংসারে চেষ্টা যে যতই করুক্ অবস্থা ভেদে তার ফল নানারকম ঘটে থাকে— সে কেউ নিবারণ করতে পারে না, অতএব আমরা কেবল কর্ত্তব্য করে যাব এইটুকুই আমাদের হাতে— ফলাফলের দ্বারা অকারণ নিজেকে উদ্বেজিত হতে দেব না। ভালমন্দ দুই অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করবার শক্তি অর্জ্জন করতে হবে— ক্রমাগত পদে পদে রাত্রিদিন এই অভ্যাসটি করতে হবে— যখনি মনটা বিকল হতে চাইবে তখনি আপনাকে সংযত স্বাধীন করে নিতে হবে, তখনি মনে আন্‌তে হবে সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ ফলাফল থেকে আমি পৃথক্— আমি একমাত্র এই সংসারের নই— আমার অতীতে যে অনন্তকাল ছিল সেখানে আমার সঙ্গে এই সংসারের কি যোগ ছিল, এবং আমার ভবিষ্যতে যে অনন্ত কাল পড়ে আছে সেখানেই বা এই সমস্ত সুখদুঃখ ভালমন্দ লাভ অলাভ কোথায়! যেখানে যে কয়দিন থাকি সেখানকার

কাজ কেবল সযত্নে সম্পন্ন করতে হবে—আর কিছুই আমাদের দেখবার দরকার নেই। সর্ব্বদা প্রসন্নতা রাখ্‌তে হবে, চারিদিকের সকলকে প্রসন্নতা দান করতে হবে—সকলে যাতে সুখী হয় এবং ভাল হয় আমি প্রফুল্লমুখে এবং অশ্রান্ত চিত্তে সেই চেষ্টা করব—তার পরে বিফল হই তাতে আমার কি?—ভাল চেষ্টার দ্বারাতেই জীবন সার্থক হয়—ফল সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হাতে। কেবল কর্ত্তব্য করেই প্রফুল্ল হতে হবে—ফল না পেয়েও প্রফুল্লতা রাখতে হবে—তার একমাত্র উপায় মনকে সর্ব্বপ্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে সর্ব্বদা মুক্ত করে রাখা।

রবি

২১

[কলকাতা। ১৬ ডিসেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

কাল ত তোমার চিঠি পাওয়া যায় নি। আজও তোমার চিঠি পাই নি মনে করে টেলিগ্রাফ করতে উদ্যত হয়েছিলুম। তার পরে স্নান করে বেরিয়ে এসে তোমার চিঠি পাওয়া গেল কিন্তু তাতে কাল চিঠি লেখনি এমন কোন খবর দেখলুমনা—ঠিক বোঝা গেল না।

কাল নগেন্দ্রকে প্রিয়বাবু নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেইসঙ্গে আমাদেরও ছিল। কাল প্রায় ১টা থেকে রাত্রি সাড়ে

সাতটা পর্য্যন্ত রিহার্সাল ছিল, তার পরে প্রিয়বাবুর ওখানে গিয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি আস্‌তে হল।

নীতু কাল রাত্রে ঘুমিয়েছে। তার লিভারের বেদনা প্রায় গেছে। জ্বর আজ ১০০°র কাছাকাছি আছে। লিভারটা পরীক্ষা করে ডাক্তার বল্‌চেন অনেক কমেচে।

আজ বিকালে আমাদের অভিনয়। ডাক্তার বেচারা দেখবার জন্য লুব্ধ হওয়াতে আজ তাকে একখানা টিকিট দিয়েছি— নগেন্দ্রও যাবে।—ডাক্তার ও নগেন্দ্র কাল সকালে চলে যাবে— নগেন্দ্রকে এখন এখানে রাখলে কাজের ক্ষতি হবে।

গিরিশঠাকুর এসেছিল। সে ইংরাজি বাংলা সব রকম বেশ ভাল রাঁধতে পারে—কিছু বেশি মাইনে নেবে কিন্তু কেউ এলে খাওয়াবার কোন ভাবনা থাক্‌বে না। তুমি কি বল?

এবারে আমি ফিরে গিয়েই চরে আড্ডা করব—সে তোমাদের খুব ভাল লাগ্‌বে আমি জানি। ইতিমধ্যে নীতু একটু সেরে উঠ্‌লে তাকে মধুপুরে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

তোমার মাকে ১৫ টাকা পাঠিয়ে দিতে যদুকে বলে দেব।

বিপিন অনেকটা সেরে উঠেছে— এখনো সে নুয়ে কাজ করতে পারে না— কিন্তু চল্‌তে ফিরতে পারচে। বেহারাটা দুই একদিনের মধ্যেই শিলাইদহে যেতে পারবে। তোমার নতুন ছোকরা চাকরটা কি রকম কাজের হয়েছে? আজ ত পয়লা— এখনো ৭ই পৌষের লেখায় হাত দিতে পারিনি বলে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। কাল যেমন করে হোক্‌ লিখ্‌তে বস্‌তে হবে।× × ×

[কলকাতা। ১৭ ডিসেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

তোমার সন্ধ্যা বেলাকার মনের ভাবে আমার কি কোন অধিকার নেই? আমি কি কেবল দিনের বেলাকার? সূর্য্য অস্ত গেলেই তোমার মনের থেকে আমার দৃষ্টিও অস্ত যাবে? তোমার যা মনে এসেছিল আমাকে কেন লিখে পাঠালে না? তোমার শেষের দু চার দিনের চিঠিতে আমার যেন কেমন একটা খট্‌কা রয়ে গেছে। সেটা কি ঠিক analyze করে বল্‌তে পারিনে কিন্তু একটা কিসের আচ্ছাদন আছে। যাক্‌গে! হৃদয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করাটা লাভজনক কাজ নয়। মোটামুটি সাদাসিধে ভাবে সব গ্রহণ করাই ভাল।

আজ নীতু ভাল আছে। অল্প জ্বর আছে— প্রতাপবাবু বলেন অমাবস্যাটা গেলে সেটা ছেড়ে যেতেও পারে। জ্বরটা গেলেই তাঁর মতে বিলম্ব না করে মধুপুরে পাঠিয়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাই ঠিক করেছি। লিভারের আয়তন এবং বেদনা অনেকটা কমে এসেছে।

কাল রাত্রে প্রায় সমস্ত রাত ধরে স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি আমার উপরে রাগ করে আছ এবং কি সব নিয়ে আমাকে বকৃচ। যখন স্বপ্ন বই নয় তখন সুস্বপ্ন দেখ্‌লেই হয়— সংসারে জাগ্রৎ অবস্থায় সত্যকার ঝঞ্ঝাট অনেক আছে— আবার মিথ্যাও যদি অলীক ঝঞ্ঝাট বহন করে আনে তাহলেত আর

পারা যায় না। সেই স্বপ্নের রেশ নিয়ে আজ সকালেও মনটা কি রকম খারাপ হয়ে ছিল। তার উপরে আজ সমস্ত সকাল ধরে লোকসমাগম হয়েছিল— ভেবেছিলুম ৭ই পৌষের লেখাটা লিখ্‌ব তা আর লিখ্‌তে দিলে না। সকালে নাবার ঘরে দুটো নৈবেদ্য লিখ্‌তে পেরেছিলুম।

রবি

২৩

[কলকাতা। ২০ ডিসেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

বড় হোক্‌ ছোট হোক্‌ ভাল হোক্‌ মন্দ হোক্‌ একটা করে চিঠি আমাকে রোজ লেখনা কেন? ডাকের সময় চিঠি না পেলে ভারি খালি ঠেকে। আজ আবার বিশেষ করে তোমার চিঠির অপেক্ষা করছিলুম— রথী আস্‌বে কিনা তোমার আজকের সকালের চিঠিতে জান্‌তে পারব মনে করেছিলুম। যাই হোক্‌ চিঠি না পেলে কি রকম লাগে তোমাকে দেখাবার ইচ্ছা আছে। কাল বিকালে আমরা বোলপুরে চলে যাচ্চি অতএব এ চিঠির উত্তর তোমাকে আর লিখ্‌তে হবে না— একদিন ছুটি পাবে। রবিবার সকালে এসে আশা করি তোমার একখানা চিঠি পাওয়া যাবে। শনিবারে আমরা শান্তিনিকেতনে থাক্‌ব, সেদিন আমিও চিঠি লিখ্‌তে সময় পাব না।

নায়েবের ভাইয়ের খবর কি ? নীতুর লিভার আজ পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা সম্পূর্ণ কমে গেছে— এখন কেবল তার কাশি এবং জ্বরটা কমলেই তাকে মধুপুরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা যাবে। জ্বর খুব অল্প অল্প করে কমচে— অমাবস্যা গেলে হয়ত ছাড়তে পারে।

তোমাদের বাগান এখন কি রকম ? কিছু ফসল পাচ্চ ? কড়াইস্‌টি কতদিনে ধরবে ? ইঁদারায় ফটিক রোজ ফট্‌কিরি দিচ্চে ত ? জল সাফ হচ্চে ? বামুন বাম্‌নীতে কি ভাবে চল্‌চে ? বিমলা সম্বন্ধে তোমার মত আমাকে শীঘ্র লিখো। ৭ই পৌষের লেখাটা নানা বাধার মধ্যে লিখ্‌চি এখনো শেষ হয় নি। এখন সেই লেখাটাতে হাত দিই গে যাই।

রবি

২৪

[কলকাতা। ২১ ডিসেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ একদিনে তোমার দুখানা চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। কিন্তু তার উপযুক্ত প্রতিদান দেবার অবসর নেই। কেবল × । আজ বোলপুর যেতে হবে। বাবামশায়কে আমার লেখা শোনালুম তিনি দুই একটা জায়গা বাড়াতে বল্লেন— এখনি তাই বস্‌তে হবে— আর ঘণ্টাখানেক মাত্র সময়

আছে। তাই মনের সঙ্গে হাসি দেওয়া ছাড়া আর কিছু দিতে পারলুম না। আমাকে সুখী করবার জন্যে তুমি বেশি কোন চেষ্টা কোরো না— আন্তরিক ভালবাসাই যথেষ্ট। অবশ্য তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকল ভাবেই যদি যোগ থাকৃত খুব ভাল হত— কিন্তু সে কারো ইচ্ছায়ত্ত নয়। যদি তুমি আমার সঙ্গে সকল রকম বিষয়ে সকল রকম শিক্ষায় যোগ দিতে পার ত খুসি হই— আমি যা কিছু জান্‌তে চাই তোমাকেও তা জানাতে পারি— আমি যা শিখতে চাই তুমিও আমার সঙ্গে শিক্ষা কর তাহলে খুব সুখের হয়। জীবনে দুজনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়— তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করিনে— কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে— আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই— সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুঁৎ খুঁৎ না করে ভালবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর— আমাকে অনাবশ্যক দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে। × × × × ×

রবি

২৫

[কলকাতা। জানুয়ারি ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি—

কাল যখন বাড়ি ফিরে এলুম তখন ঢংঢং করে দুপুর বেজে গেল। সকালে গান শেখাবার কাজ সেরে খেয়ে দেয়ে নাটোরের বাড়িতে যাওয়া গেল— অমলার সন্ধানে। দেখি হেশ নাটোরের ছবি আঁকচে— রাণীর ছবিও খানিকটা আঁকা পড়ে আছে। অমলার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করা গেল— অমলা বল্লে যখন হাতে পেয়েছি তখন ছাড়ব কেন, আমাদের বাড়িতে যাবেন সেখানে গান সম্বন্ধে আলোচনা হবে। আজ তিনটের সময় তাদের সেই বির্জ্জিতলার বাড়িতে গিয়ে মিষ্টান্ন ভোজন ও মিষ্ট কথার আলোচনা করতে হবে। ওখান থেকে সরলার সন্ধানে গেলুম— সরলা বাড়িতে নেই— তারকবাবু আর নদিদি— অনেকক্ষণ সরলার জন্যে অপেক্ষা করা গেল এলনা— নদিদি বল্লেন কাল সকালে এসে খেয়ো সেই সঙ্গে সরলাকে গান শিখিয়ে নিয়ো— তাতেই রাজি। তারকবাবু বল্লেন খাবার আগে আমার ওখানে যেয়ো পুরীর বাড়িসম্বন্ধে কথা আছে— তাই সই। আজ সকালে স্নান করে প্রথমে তারকবাবু, পরে নদিদি, পরে সুরেন, পরে অমলাকে সেরে বাড়ি এসে ১১ই মাঘের গান শিখিয়ে রাত্রে সঙ্গীতসমাজ সেরে ১২টার সময় নিদ্রার আয়োজন করতে হবে। ওদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন— রাত্রে খুব এক চোট বৃষ্টি হয়ে গেছে—

আবার হবার মত মেঘ জমে রয়েছে। শীতকালে আমি ত কখনো এমন মেঘ দেখি নি। তোমাদের ওখানেও সম্ভবতঃ এই রকম মেঘের আয়োজন হয়েছে— এই শীতকালের বাদল তোমাদের নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগ্‌চে— আমি ত সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে কাটাই, ভাল মন্দ লাগবার অবসরমাত্র পাই নে— বিকেলের দিকে যখন শরীরটা শ্রান্ত হয়ে আসে তখন স্বভাবতই তোমাদের দিকে মনটা চলে যায়— তখন গাড়ি হয় ত কলকাতার জনারণ্যের মধ্যে দিয়ে ছুট্‌চে আর আমার সমস্ত চিন্তা শিলাইদহের ঘর কখানার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চে। কলকাতার রাস্তায় গাড়ির মধ্যে এবং দুপুর রাত্রে বিছানায় ঢুকে তোমাদের মনে করবার অবকাশ পাই— বাকী কেবল গোলমাল। আজ তোমার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই আমাকে বেরতে হবে তাই সকালে উঠেই তোমাকে চিঠি লিখে নিচ্চি— চিঠি সেরেই স্নান করতে যাব— স্নান করেই দৌড়। সেদিন সত্যর ছেলেদের দেখলুম— বেশ ছোটখাট গোলগাল দেখতে হয়েছে— ভারি মজার রকম ধরণের। বড়দিদি এগারই মাঘের আগেই চলে আস্‌চেন— গগনরাও দশই মাঘে আস্‌বে আবার সমস্ত ভরপূর হয়ে উঠ্‌বে। ইলেক্ট্রীক আলোর তার গগনদের বাড়িতে আস্‌চে, ওদের হয়ে গেলেই অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের শূন্যঘরেও বিদ্যুতের আলো জ্বলতে সুরু হবে। আজ তবে অনেক হামি দিয়ে স্নান করতে যাই।

তোমার রবি

২৬

[কলকাতা। ১৯ জানুয়ারি ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি—

কাল সুরেনের ওখানে গিয়েছিলুম। সে একটু ভাল বোধ করচে—তাকে এখন প্রতাপ মজুমদার চিকিৎসা করচেন—কাল অমাবস্যা, তাই জ্বরটা বোধ হয় অমাবস্যা না কাট্‌লে কম্‌বেনা। মেজবোঠান কালও বেলা এবং রেণুকাকে আনাবার জন্যে বিশেষ করে বল্‌লেন—বিবির বাড়িতে ওদের রাখ্‌তে কোন অসুবিধা হবেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি কি বিবেচনা কর—ওরা এত করে আস্‌তে চাচ্চে—না আস্‌তে পারলে বড় নিরাশ হবে—তাই ওদের জন্যে মায়া হয়—নগেন্দ্রর সঙ্গে রাণী রথী বেলাকে একটা সেকেণ্ডক্লাস রিজার্ভ করে পাঠালে মন্দ হয় না—মঙ্গলবার ৯ই মাঘে আস্‌বে—১১ই মাঘ দেখে নীতুর সঙ্গে চলে যেতে পারে। মেজবোঠান জান্‌তে চান কোন্ ট্রেনে আস্‌বে—তাদের আনতে গাড়ি পাঠাবেন। যদি পাঠানই স্থির কর তাহলে টেলিগ্রাফ কোরো—না হলে জানব আস্‌বেনা। ছুতিনদিনের জন্যে বেলা বিবিদের ওখানে থাক্‌লে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিনে। যাহোক্ তুমি যা ভাল বিবেচনা কর তাই কোরো। মেজবোঠান তোমাকে বল্‌তে বলে দিয়েছেন যে দাসী পাওয়া যাবে—বোধহয় শীঘ্র পাঠাতে পারবেন। শেলাই প্রভৃতি জানে এমন ভদ্ররকম ক্রিশ্চান্ দাসীও পাওয়া যেতে পারে—

চাও ত বলি— মাইনে টাকা আষ্টেক। আমার ত বোধ হয় এ-রকম দাসী হলে তোমার মন্দ হয় না। আমরা এবার বোটে গিয়ে থাক্‌ব— সেখানে চাকরের অভাব তুমি তেমন অনুভব করবে না— তপ্‌সি থাক্‌বে, অন্যান্য মাঝিও থাক্‌বে, তোমার ফটিক থাকবে পুঁটে থাক্‌বে, বিপিন থাক্‌বে, মেথর থাক্‌বে — অনায়াসে চলে যাবে— ল্যাম্পের ল্যাঠা নেই, জল তোলার হাঙ্গাম নেই, ঘর ঝাঁড় দেওয়ার ব্যাপার নেই— কেবল খাবে স্নান করবে, বেড়াবে এবং ঘুমবে। কালও রাত দুপুরের সময় এসেছি— সমস্ত দিন উৎপাত গেছে। আজ সকাল বেলায় এক চোট সাক্ষাৎকারীদের সমাগম এবং গান-শিক্ষার হাঙ্গাম শেষ করে আহারটি করেই তোমাকে লিখ্‌তে বসেছি— এখনি সঙ্গীতসমাজওয়ালারা তাদের রিহার্সালের জন্যে আমাকে ধরতে আসবে— সেখানে ৪টে পর্যন্ত চেঁচামেচি করে সুরেন[কে] দেখ্‌তে বালিগঞ্জে যাব— সেখান থেকে সরলাকে তুলে নিয়ে এসে গান শেখানর ব্যাপারে রাত নটা বেজে যাবে— তার পরে সঙ্গীতসমাজে আবার রিহার্সালে রাত দুপুর হয়ে যাবে। —চৈতন্য ভাগবত এনেছি— বিপিন একখানা মলিদা ও একটা রাগ্‌ এনেছে দেখেছি— মলিদা আনবার কি দরকার ছিল আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। নানা ব্যস্ততার মাঝখানে অল্প একটুখানি অবকাশে তোমাকে তাড়াতাড়ি করে লিখে ফেলতে হয় ভাল করে মন দিয়ে লিখতে পারিনে। × × × × × × ×

রবি

২৭

[এলাহাবাদ। ৩১ জানুয়ারি ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ এলাহাবাদে এসে পৌঁচেছি। সুসি এবং তার মার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সুসি যেতে রাজি হয়েচে, তার মাও সম্মতি দিয়েচেন। কলকাতা হয়ে শিলাইদহে যাওয়াই স্থির হল। যে রকম বাধা পাব মনে করেছিলুম তার কিছুই নয়। ভাল করে বুঝিয়ে বলতেই উভয়েই রাজি হল। পর্শু অর্থাৎ শনিবারে এখান থেকে ছাড়ব। ভাগ্যি সুরেন মোগলসরাই থেকে আমার সঙ্গ নিলে নইলে একা একা এই হোটেলে পড়ে পড়ে ক'টা দিন কাটান আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর হত।

কলকাতায় আমার শরীরটা ভারি খারাপ হয়ে এসেছিল। যাত্রার দিনে দশ গ্রেন কুইনীন খেয়ে বেরিয়েছিলুম—পথেই অনেকটা আরাম পেলুম—আজ আর শরীরে কোন গ্লানি নেই।

কাল রাত্রে গাড়ি ছেড়ে দিলে পর আলোগুলোর নীচে পর্দ্দা টেনে দিয়ে অন্ধকার করে দেওয়া গেল—বাইরে চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল—আমি গাড়িতে একলা ছিলুম—মনটা বড় একটি সুমিষ্ট মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল—তুমি তখন কোথায় কি করছিলে? ছাতে ছিলে, না ঘরে? কি ভাবছিলে, আমার হৃদয়টি জ্যোৎস্নারই মত স্নিগ্ধকোমলভাবে তোমাদের উপরে ব্যাপ্ত হয়েছিল— তার মধ্যে বাসনা বেদনার

তীব্রতা ছিলনা— কেবল একটি আনন্দ বিষাদমিশ্রিত সুমঙ্গল সুমধুর ভাব। × × × ×

রবি

২৮

[শিলাইদহ। জুন? ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

কাল পুণ্যাহের গোলমালে তোমাকে চিঠি লিখ্তে পারিনি। পর্শুদিন বিকেলে শিলাইদহে এসে পৌঁছলুম। শূন্য বাড়ি হাঁ হাঁ করছে। মনে করেছিলুম অনেকদিন নানা গোলমালের পর একলা বাড়ি পেয়ে নির্জ্জনে আরাম বোধ করব। কিন্তু যেখানে বরাবর সকলে মিলে থাকা অভ্যাস, এবং একত্রবাসের নানাবিধ চিহ্ন বর্ত্তমান সেখানে একলা প্রবেশ করতে প্রথমটা কিছুতেই মন যায় না। বিশেষতঃ পথশ্রমে শ্রান্ত হয়ে যখন বাড়িতে এলুম তখন বাড়িতে কেউ সেবা করবার, খুসি হবার, আদর করবার লোক পেলুম না। ভারি ফাঁকা বোধ হল। পড়তে চেষ্টা করলুম পড়া হল না। বাগান প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে কেরোসিন্-জ্বালা শূন্য ঘর বেশি শূন্য মনে হতে লাগ্ল। দোতলার ঘরে গিয়ে আরো খালি বোধ হল। নীচে নেমে এসে আলো উস্কে দিয়ে আবার পড়বার চেষ্টা করলুম— সুবিধে করতে পারলুম না।

সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়লুম। দোতলার পশ্চিমের ঘরে আমি এবং পূর্ব্বের ঘরে রথী শুয়েছিল। রাত্রি রীতিমত ঠাণ্ডা—গায়ে মলিদা দিতে হয়েছিল। দিনেও যথেষ্ট ঠাণ্ডা। কাল বাজনাবাদ্য উপাসনা ইত্যাদি করে পুণ্যাহ হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় কাছারিতে একদল কীর্ত্তনওয়ালা এসেছিল। তাদের কীর্ত্তন শুন্‌তে রাত এগারোটা হয়ে গেল।

তোমার শাকের ক্ষেত ভরে গেছে। কিন্তু ডাঁটা গাছ-গুলো বড্ড বেশি ঘন ঘন হওয়াতে বাড়তে পারচেনা। চালানের সঙ্গে তোমার শাক কিছু পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। কুম্‌ড়ো অনেকগুলো পেড়ে রাখা হয়েছে। নীতু যে গোলাপ গাছ পাঠিয়েছিল সেগুলো ফুলে ভরে গেছে কিন্তু অধিকাংশই কাঠগোলাপ — তাকে ভয়ানক ফাঁকি দিয়েছে। রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, মালতী, ঝুম্‌কো, মেদি খুব ফুট্‌চে। হাস্নু-ও-হানা ফুট্‌চে কিন্তু গন্ধ দিচ্চেনা, বোধ হয় বর্ষাকালে ফুলের গন্ধ থাকেনা।

ছুটো চাবি পেয়েছি— কিন্তু আমার কর্পূর কাঠের দেরাজের চাবিটা দরকার। তার মধ্যে রথীর ঠিকুজি আছে সেইটের সঙ্গে মিলিয়ে রথীর কুষ্ঠি পরীক্ষা করতে দিতে হবে। সেটা চিঠি পেয়েই পাঠিয়ো।

নীতু কেমন আছে লিখো। প্রতাপবাবু রোজ দেখ্‌তে আস্‌চেন ত ? যাতে ওষুধ নিয়মিত খাওয়া হয় দেখো।

পুকুর জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সামনে আখের ক্ষেত খুব বেড়ে উঠেছে। চতুর্দ্দিকের মাঠ শেষ পর্য্যন্ত শস্যে

পরিপূর্ণ— কোথাও সবুজের বিচ্ছেদ নেই। সবাই জিজ্ঞাসা করচে মা কবে আস্‌বেন? আমরা আস্‌বনা শুনে এখানকার আমলারা খুব দমে গিয়েছিল।

শরতের আর চিঠিপত্র এসেছে? তার সম্বন্ধে আর কোন খবরবার্ত্তা আছে? বেলা যেন তাকে ভাল করে চিঠিপত্র লেখে। কি পাঠ লিখ্‌তে হবে যদি ভেবে না পায় আমাদের চিরকেলে দস্তুরমত শ্রীচরণকমলেষু লিখ্‌লেই হয়— বাঁধাদস্তুরে গেলে ভাবনা থাকেনা। এখান থেকে কোন জিনিষ যদি দরকার থাকে লিখো। দই মাছ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। × × × × ×

রবি

২৯

[শিলাইদহ। জুন? ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

পুণ্যাহের চালান আজ যাবে মনে করেছিলুম—কিন্তু আরো কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টায় গেলনা। কাল যাবে। আমার আম ফুরিয়ে এসেছে। কিছু আম না পাঠিয়ে দিলে অসুবিধা হবে। খাওয়া দাওয়া আমাদের সাদাসিধে রকম চল্‌চে, তাতে শরীরটা বেশ ভাল আছে। বামুন ঠাকুর শিলাইদহের সুবিখ্যাত লালমোহন তৈরি করেছিল—

লোভ সত্ত্বেও আমি খাইনি— দেখ্‌ছি কোন রকম মিষ্টি না খেয়েই শরীরটা ভাল আছে— মিষ্টি খেলেই পাকযন্ত্র বিগ্‌ড়ে যায়। কুঞ্জ ঠাকুরকে ত আমি নিয়ে এলুম, তোমাদের আহারাদিটা কি রকম চল্‌চে? আমার এখানে কেবল মাত্র কুঞ্জ এবং ফটিকে বেশ শান্তভাবে কাজ চলে যাচ্ছে— বিপিনের জলদমন্দ্রকণ্ঠস্বর না থাকাতে শিলাইদহ দিব্যি নিস্তব্ধ হয়ে আছে— কাজ চল্‌চে অথচ কাজের আস্ফালন না থাকাতে বেশ আরাম বোধ হচ্চে— বিপিন থাকলে মনে হত অপরিমিত কাজের তাড়ায় সমস্ত সংসার যেন উৎখাত হয়ে রয়েছে, কোথাও কারো যেন হাঁপ ছাড়বার সময় নেই। আমার ইচ্ছে কোন কথাটি না কয়ে সমস্ত কাজ নিঃশব্দে নিয়মমত হয়ে যায়— আয়োজন বেশি না হয় অথচ সমস্ত বেশ সহজে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন এবং সুসম্পন্ন হয় —বেশ নিয়মে চলে অথচ অল্পে চলে এবং নিঃশব্দে চলে। একলা থাকার ঐ একটা সুখ আছে স্বীকার করতে হবে, চারদিকে প্রভূত চেষ্টার চিহ্ন এবং সরঞ্জামের ভিড় থাকে না— তাতে মনটা বেশ মুক্ত থাকৃতে পায়। আমি আছি বলে পৃথিবীতে একটা হুলস্থূল কাণ্ড চল্‌চেনা এইটেতে বড় হাল্কা বোধ হয়—আজকাল আমার চারদিকে লোকজন হাঁসফাঁস তোলপাড় ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করচে না বলে আমার অবসরকালকে খুব বৃহৎ খুব প্রশস্ত মনে হচ্চে। সকালে ঠিক সময়েই দুটি আম খাই, দুপুরবেলায় অন্ন, বিকেলেও দুটি আম এবং রাত্রে গরম লুচি ও ভাজা—

সাদাসিধে খাওয়া ও নিয়মমত খাওয়া বলে ক্ষুধা থাকে খেয়ে তৃপ্তি হয়— ঘড়ি ঘড়ি ওষুধ খেতে হয় না। কোন রকম করে জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সরল করে না আন্‌তে পারলে জীবনে যথার্থ সুখের স্থান পাওয়া যায় না— জিনিষপত্রে গোলেমালে হাঙ্গামহুজ্জতে হিসেবপত্রেই সুখসন্তোষের সমস্ত জায়গা নিঃশেষে অধিকার করে বসে— আরামের চেষ্টাতেই আরাম নষ্ট করে দেয়। বহির্ব্যাপারের চেষ্টাকে লঘু করে দিয়ে মানসিক ব্যাপারের চেষ্টাকে কঠিন করে তোলাই মনুষ্যত্বের সাধনা। ছোটখাট ব্যাপারেই জীবনকে ভারগ্রস্ত করে ফেল্‌লে বড় বড় ব্যাপারকে ছেঁটে ফেল্‌তে হয়, সামান্য জিনিষেই সংসারের পথ জটিল হয়ে ওঠে এবং সকলের সঙ্গে সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। আমার প্রাণের ভিতরটা কেবলি অহর্নিশি ফাঁকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে— সে ফাঁকা কেবল আকাশ বাতাস এবং আলোকের নয়-- সংসারের ফাঁকা, আয়োজন আস্‌বাবের ফাঁকা, চেষ্টা চিন্তা আড়ম্বরের ফাঁকা— খাওয়া পরা আচার ব্যবহার সমস্ত সরল সংযত পরিমিত পরিচ্ছন্ন— চারিদিকে বেশ সহজ শান্ত স্বল্পতা— ড্রয়িংরুম না, ডাইনিংরুম্ না, নবাবীও না— তক্তপোষ এবং ঢালা বিছানা— শান্তি এবং সন্তোষ— কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা না, বিরোধ না, স্পর্দ্ধা না— এই হলেই জীবন নিজেকে সফল করবার অবকাশ পায়। যাই নাইতে। × × × × × ×

রবি

৩০

[শিলাইদহ। জুন ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

পুণ্যাহের গোলমাল চুকে যাওয়ার পর থেকে আমি লেখায় হাত দিয়েছি। একবার কোন সুযোগে লেখার মধ্যে পড়তে পারলেই আমি যেন ডাঙ্গায় তোলা মাছ জলে গিয়ে পড়ি। এখন এখানকার নির্জ্জনতা আমাকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দান করেছে, সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি আমাকে আর স্পর্শ করতে পারচেনা, যারা আমার শত্রুতা করেছে তাদের আমি অতি সহজেই মার্জ্জনা করেছি। নির্জ্জনতায় তোমাদের পীড়া দেয় কেন তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারচি— আমার এই ভাব সম্ভোগের অংশ তোমাদের যদি দিতে পারতুম তা হলে আমি ভারি খুসি হতুম, কিন্তু এ জিনিষ কাউকে দান করা যায় না। কলকাতার জনতা ছেড়ে হঠাৎ এখানকার মত শূন্যস্থানের মধ্যে এসে পড়ে প্রথম কিছুদিন নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল লাগ্‌বেনা— এবং তার পরে সয়ে গেলেও ভিতরে ভিতরে একটা রুদ্ধ অধৈর্য্য থেকে যাবে। কিন্তু কি করি বল, কলকাতার ভিড়ে আমার জীবনটা নিষ্ফল হয়ে থাকে— সেই জন্যে মেজাজ বিগড়ে গিয়ে প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আক্ষেপ করতে থাকি— সকলকে মনের সঙ্গে ক্ষমা করে বিরোধ ত্যাগ করে অন্তঃকরণের শান্তি রক্ষা করে চল্‌তে পারি নে। তা ছাড়া সেখানে রথীদের উপযুক্ত শিক্ষা কিছুতেই হয় না—

সকলেই কি রকম উড়ুউড়ু করতে থাকে। কাজেই তোমাদের এই নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করতেই হবে। এর পরে যখন সামর্থ্য হবে তখন এর চেয়ে ভাল জায়গা বেছে নিতে হয় ত পারব, কিন্তু কোনকালেই আমি কলকাতায় নিজের সমস্ত শক্তিকে গোর দিয়ে থাকৃতে পারবনা। সমস্ত আকাশ অন্ধকার করে নিবিড় মেঘ জমে এসে বৃষ্টি আরম্ভ হল— আমার নীচের ঘরের চারিদিকের শাসি বন্ধ করে এই বর্ষণদৃশ্য উপভোগ করতে করতে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি। তোমাদের সেখানকার দোতলার ঘর থেকে এ রকম চমৎকার ব্যাপার দেখতে পেতে না। চারিদিকের সবুজ ক্ষেতের উপরে * * * স্নিগ্ধ তিমিরাচ্ছন্ন নবীন বর্ষা ভারি সুন্দর লাগ্‌চে।[১] বসে [বসে] মেঘদূতের উপর একটা প্রবন্ধ লিখ্‌চি। [এই] প্রবন্ধের উপর আজকের এই নিবিড় বর্ষার দিনের বর্ষণমুখর ঘনান্ধকারটুকু যদি এঁকে রাখ্‌তে পারতুম, যদি আমার শিলাইদহের সবুজ ক্ষেতের উপরকার এই শ্যামল আবির্ভাবটিকে পাঠকদের কাছে চিরকালের জিনিষ করে রাখ্‌তে পারতুম তাহলে কেমন হত! আমার লেখায় অনেক রকম করে অনেক কথা বল্‌চি— কিন্তু কোথায় এই মেঘের আয়োজন, এই শাখার আন্দোলন, এই অবিরল ধারাপ্রপাত, এই আকাশপৃথিবীর মিলনালিঙ্গনের ছায়াবেষ্টন! কত সহজ! কি অনায়াসেই জলস্থল আকাশের উপর এই নির্জ্জন মাঠের নিভৃত বর্ষার

১ ইহার পর কিয়দংশ বিনষ্ট।

দিনটি— এই কাজকর্ম্মছাড়া মেঘেঢাকা আষাঢ়ের রৌদ্রহীন মধ্যাহ্নটুকু ঘনিয়ে এসেছে— অথচ আমার সেই লেখার মধ্যে তার কোন চিহ্নই রাখ্‌তে পারলুম না— কেউ জান্‌তে পারবেনা কোন্‌দিন কোথায় বসে বসে সুদীর্ঘ অবসরের বেলায় লোকশূন্য বাড়িতে এই কথাগুলো আমি আপনমনে গাঁথছিলুম। খুব এক পস্‌লা বর্ষণ হয়ে থেমে এসেছে— এই বেলা চিঠি পাঠাবার উদ্যোগ করা যাক্‌। × × × × ×

রবি

৩১

[শিলাইদহ। ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

লরেন্স আজ সকালে এসে উপস্থিত। বোধ হয় ক'দিন কলকাতায় খুব মদ চালাচ্ছিল। আজ সকালেও আমার কাছ থেকে একটু হুইস্কি চেয়ে খেলে। ওর দুর্দ্দশা দেখে দুঃখ হয়। এ পর্য্যন্ত কোন চাকরীর যোগাড় করতে পারলেনা— ওর কি যে অবস্থা হবে বুঝতে পারচিনে। যখন বল্লে, I am so sorry to miss Mira, আমার মনটা আর্দ্র হল। ও হয়ত জানে আমি মীরাকে ভালবাসি সেইজন্যেই বিশেষ করে তার নাম করলে তবু আমার মনে লাগ্‌ল। হাজার হোক্‌ আজ সাড়ে তিন বৎসর আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছিল।

এইবারে সুবিধা পেয়ে কলকাতায় সুপ্রকাশরা ওকে খুব অপমান করে নিয়েছে। এখানে খুব গরম পড়েছে। শরীর আমার বেশ ভালই আছে কিন্তু রাত্রে ভাল ঘুমতে পারিনে—অনেক রাত্রে জেগে উঠে জ্যোৎস্নায় বসে থাকি— হিম কিছুমাত্র নেই। কাল বসে বসে মনে পড়ছিল এই ছাদের উপর তোমার অনেক মর্ম্মান্তিক দুঃখের সন্ধ্যা ও রাত্রি কেটেছে—আমারও অনেক বেদনার স্মৃতি এই ছাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। যদি অনেক রাত্রে এই ছাদের জ্যোৎস্নায় তুমি বস্‌তে তাহলে বোধ হয় আবার তোমার মন ধীরে ধীরে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আস্‌ত। আমি এখন সংসারকে এত মরীচিকার মত দেখি যে, কোন খেদের কথা মনে উঠ্‌লে পদ্মপত্রে জলের মত শীঘ্রই গড়িয়ে যায়— আমি মনে মনে ভাবি আর একশো বৎসর না যেতেই আমাদের সুখদুঃখ এবং আত্মীয়তার সমস্ত ইতিবৃত্ত কোথায় মিলিয়ে যাবে— তা ছাড়া অনন্ত নক্ষত্র-লোকের দিকে যখন তাকাই এবং এই অনন্ত লোকের নীরব সাক্ষী যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দিকে মনকে মুখোমুখি স্থাপন করি তখন মাকড়ষার জালের মত ক্ষণিক সুখদুঃখের সমস্ত ক্ষুদ্রতা কোথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায় দেখ্‌তেও পাওয়া যায় না। × × ×

তোমার রবি

[মজঃফরপুর। ১৩ জুলাই ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কোরো জামাইবাড়ি এসে আমি কি রকম সাজসজ্জায় মনোযোগ করেছি। ঢাকাই ধুতি চাদর ছাড়া আর কথা নেই। এখানকার লোকেরা জানে আমি শরতের শ্বশুর, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ, জগদ্বিখ্যাত মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ রবি ঠাকুর, আমার বেশভূষা দেখে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। রোজ সন্ধ্যা-বেলায় দলে দলে বাঙালিরা এই অদ্ভুত কৌতুক দেখবার জন্যে সমাগত হচ্চে— শরতের ঘরে আর জায়গা হয় না— মনে করচি ঢাকাইটা ছাড়তে হবে— নইলে লোকের আমদানি বন্ধ করা যাবে না। শরৎ ত ভীড় দেখে ভয় পেয়ে গেছে। তোমার কথা শুনে আমার এই দুর্গতি হল। তোমার বুদ্ধিতেই বেলার গয়না খোয়া গেছে। আমি তাই মনে স্থির করেছি তোমার বুদ্ধিতে আর চল্‌বনা— আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেও লিখ্‌চে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। বোধ হয় শাস্ত্রকারদের স্ত্রীরা স্বামীদের জোর করে ঢাকাই ধুতি পরাত।

বেলা বোধ হচ্চে এখন বেশ স্থির হয়ে নিজের ঘরকন্নাটি জুড়ে নিয়ে বসেছে। গোছান গাছানর কাজে এখন ওর দিনকতক বেশ কাট্‌বে। ওর সেই সব শামুক শাঁখ প্রভৃতি বেরিয়েছে। যেখানে ওর বসবার ঘর স্থির হয়েছে সে ওর

পছন্দ হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় শরতে ওতে মিলে কুমারসম্ভব পড়া হবে এই রকম একটা কল্পনাও চল্‌চে। যদিও পড়াশুনো কি রকম অগ্রসর হবে সে সম্বন্ধে আমার খুব সন্দেহ আছে।

আজ রোদ উঠে চতুর্দ্দিক বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। প্রথম এসেই দিন দুই খুব মেঘলা এবং গুমট গেছে। নতুন জায়গায় এবং নতুন সংসারে প্রবেশের সময় এই রকম অন্ধকার এবং গুমটভাবে মনটাকে পীড়িত করে। সেইটে কেটে গিয়ে আজ সূর্য্যালোকে সমস্ত বেশ প্রসন্ন-মূর্ত্তি ধারণ করেছে। একটা আশ্চর্য্য এই দেখচি এই বিবাহ ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদে প্রায় আরম্ভটায় গোলমাল এবং ব্যাঘাত —তার পরেই কেটেকুটে গিয়ে সমস্ত পরিষ্কার। গাড়ী রিজার্ভ করা নিয়ে কি রকম হল মনে আছে ত? বেরবার সময় কি ভয়ানক বৃষ্টি— যেতে যেতে পথেই সমস্ত চুকে গেল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওদের জীবনেও কোন বিঘ্ন বিপদ অশান্তি অনৈক্য স্থায়ী না হয়। শরৎকে যত দেখচি খুব ভাল লাগ্‌চে— ওর বাইরে কোন আড়ম্বর নেই— ওর যা কিছু সমস্ত মনে মনে। লজ্জা করে ও কিছু প্রকাশ করতে পারে না, তার থেকে ওর হৃদয়ের গভীরতা প্রমাণ হয়। বেলাকে ও খুব ভাল বাসে এবং বাসবে সন্দেহমাত্র নেই। এদিকে উপার্জ্জনশীল উদ্যমশীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিরলস, ওদিকে এলোমেলো, অসতর্ক, অসন্দিগ্ধ, টাকাকড়ি সম্বন্ধে অসাবধান— যেখানে সেখানে যা তা ফেলে রেখে দেয়, হারায়, কাউকে কিছুমাত্র সন্দেহ করে না। পুরুষমানুষের মত কাজের এবং পুরুষ-

মানুষের মত অগোছালো। এই জন্যেই ওকে বিশেষ করে আমার ভাল লাগে। [হৃষী] ঠিক উল্টো। তার সমস্ত গোনাগাঁথা, হিসেব করা—মেয়েমানুষের মত ছোটখাটোর প্রতি দৃষ্টি এবং লোকের প্রতি সন্দেহ—যত্ন আদর করতে কথাবার্ত্তা কইতে জানে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব। শরৎ সে রকম বাইরে দেখাতে পারে না তবু এখানকার সকলেই তাকে ভালবাসে—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে শরৎবাবুর মত পপ্যুলার লোক মজঃফরপুরে দ্বিতীয় নেই। মেয়েদের চোখে হৃষী যতই চটক্ লাগাক্, পুরুষোচিত ঔদার্য্য এবং আড়ম্বরহীন সরলতা ও আন্তরিক সহৃদয়তায় শরৎ হৃষীর চেয়ে সহস্রগুণে ভাল। ঠিক আমার মনের মত এমন ছেলে আমি পেতুম না। ওকে মনে করতে পার বেশি গম্ভীর, কিন্তু তা নয়—ভিতরে ভিতরে ওর মধ্যে হাস্যরস আছে—বেলার সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে বেশ ঠাট্টাঠুট্টি চলে। এখনকার সভ্য ছেলেদের মত দেশকাল পাত্র বিচার না করে সকল অবস্থাতেই ছেব্লামি করে না। যাই হোক্ শরতের সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো—এমন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জামাই তুমি হাজার খুঁজলেও পেতে না। তা ছাড়া সংসারে ও প্রতিপত্তি লাভ করবে সেও নিশ্চয়। এখন, বেলা যদি নিজেকে আপনার স্বামীর যোগ্য স্ত্রী করে তুল্‌তে পারে তাহলেই আমি চরিতার্থ হতে পারি। অমাবস্যা হয়ে গেল। নীতুর জন্যে আমার মন চিন্তিত হয়ে আছে। এ চিঠির উত্তর আমাকে দিয়ো না—এখানে আমার চিঠিপত্র কাগজ বই প্রভৃতি পাঠাতে বারণ করে

দিয়ো। বোধ হয় আমি পশু´ রওনা হয়ে একবার বোলপুর দেখে আগামী সোমবারের মধ্যে বাড়ি পৌঁছব। আমার চিঠি আদি বোলপুরের ঠিকানায় পাঠিয়ো। × × × × × × × ×

তোমার রবি

৩৩

[শান্তিনিকেতন। ২০ জুলাই ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

বেলাকে রেখে এলুম। তোমরা দূরে থেকে যতটা কল্পনা করচ ততটা নয়— বেলা সেখানে বেশ প্রসন্নমনেই আছে— নতুন জীবনযাত্রা তার যে বেশ ভালই লাগচে তার আর সন্দেহ নেই। এখন আমরা তার পক্ষে আর প্রয়োজনীয় নই। আমি ভেবে দেখ্‌লুম বিবাহের পরে অন্ততঃ কিছুকাল বাপমায়ের সংসর্গ থেকে দূরে থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার অবাধ অবসর মেয়েদের দরকার। বাপ মা এই মিলনের মাঝখানে থাক্‌লে তার ব্যাঘাত ঘটে। কারণ, পিতৃপক্ষ এবং স্বামীপক্ষের অভ্যাস রুচি প্রভৃতি একরকম নয়, একটু আধ্‌টু তফাৎ হতেই হবে— সে স্থলে বাপ মা কাছে থাক্‌লে মেয়েরা তাদের পিতৃগৃহের অভ্যাস সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে সকল রকমে মিশে যেতে পারে না। দিতে যখন হবেই, তখন আবার হাতে রাখবার চেষ্টা করা কেন? এ স্থলে মেয়ের সুখ এবং মঙ্গলই দেখবার বিষয়— নিজেদের

সুখ দুঃখের দিকে তাকিয়ে পতিগৃহের বন্ধনের সঙ্গে আবার পিতৃগৃহের বন্ধন চাপাবার কি আবশ্যক ? বেলা বেশ সুখে আছে সেই কথা মনে করে তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ শান্ত করতে চেষ্টা কোরো। আমি নিশ্চয় বল্‌চি আমরা যদি বিবাহের পরেও ওদের দুজনকে নিয়ে ঘিরে বস্‌তুম তাহলে কখনই ভাল ফল হত না। দূরে আছে বলে আদরও চিরদিন সমান থাক্‌বে। পূজার সময় যখন ওরা আস্‌বে কিম্বা আমরা যখন ওদের ঘরে যাব তখন নিবিড় এবং নবীন আনন্দ ভোগ করব। সকল ভালবাসাতেই খানিকটা পরিমাণে বিচ্ছেদ ও স্বাতন্ত্র্য থাকা দরকার। পরস্পরকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করলে কখনই মঙ্গল হয় না। রাণীও যদি বিবাহ করে দূরে যায় তাহলে ওর ভালই হবে। অবশ্য প্রথম বছর দুই আমাদের কাছে থাক্‌বে—কিন্তু তার পরে বয়স হলেই ওকে সম্পূর্ণ ভাবেই দূরে পাঠান ওর মঙ্গলের জন্যই দরকার হবে। আমাদের পরিবারের শিক্ষা রুচি অভ্যাস ভাষা ও ভাব অন্য সমস্ত বাঙালী পরিবার থেকে স্বতন্ত্র—সেইজন্যই বিবাহের পর আমাদের মেয়েদের একটু দূরে যাওয়া বিশেষ দরকার। নইলে নূতন অবস্থার প্রত্যেক ছোটখাট খুঁটিনাটি অল্প অল্প পীড়ন করে' স্বামীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও নির্ভরকে শিথিল করে দিতে পারে। রাণীর যে রকম প্রকৃতি—বাপের বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই ও শুধ্‌রে যাবে—আমাদের সঙ্গে নিকট যোগ থাক্‌লে ওর পূর্ব association যাবে না। তুমি নিজের কথা ভেবে দেখনা। আমি যদি তোমাকে বিবাহ

করে ফুলতলায় থাকৃতুম তাহলে তোমার স্বভাব ও ব্যবহার অন্য রকম হত। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে নিজের সুখ দুঃখ একেবারেই বিস্মৃত হওয়া উচিত। তারা আমাদের সুখের জন্য হয় নি। তাদের মঙ্গল এবং তাদের জীবনের সার্থকতাই আমাদের একমাত্র সুখ। কাল সমস্তক্ষণ বেলার শৈশবস্মৃতি আমার মনে পড়ছিল। তাকে কত যত্নে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কি রকম দৌরাত্ম্য করত— সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কি রকম হুঙ্কার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত— কি রকম লোভী অথচ ভালমানুষ ছিল— আমি ওকে নিজে পার্ক-ষ্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম— দার্জ্জিলিঙে রাত্রে উঠিয়ে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম— যে সময় ওর প্রতি সেই প্রথম স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল সেই সব কথা বারবার মনে উদয় হয়। কিন্তু সে সব কথা ও ত জানে না— না জানাই ভাল। বিনা কষ্টে ওর নতুন ঘরকন্নার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিজের জীবনকে ভক্তিতে প্রেমে স্নেহে সাংসারিক কর্ত্তব্যে পরিপূর্ণতা দান করুক্! আমরা যেন মনে কোন খেদ না রাখি!

আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। মাঝে মাঝে এরকম আসা যে কত দরকার তা না এলে দূরে থেকে কল্পনা করা যায় না। আমি একলা অনন্ত আকাশ বাতাস এবং আলোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যেন আদি-জননীর কোলে স্তনপান করচি। × × ×

তোমার—

৩৪

[কুষ্টিয়া। শিলাইদহের পথে। ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁচেছি। পৌঁছে একটা বিষয়ে বড় হতাশ্বাস হয়ে পড়েছি। এখানে শালাকে দেখলুম কিন্তু আমার শালাজটিকে দেখলুম না। তাকে গতকল্য কাশিতে তার মাতৃসন্নিধানে পাঠিয়ে দিয়ে কুষ্টিয়া নগরী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। তার খাট বিছানা তেমনি পড়ে রয়েছে, আলনায় তার অত্যন্ত ময়লা কাপড় ঝুল্‌চে— কিন্তু সে নেই। হায়!

তোমার মার বাতের মতো হয়ে কষ্ট পাচ্চেন। শিলাইদহে ভাল ছিলেন কুষ্টিয়ায় এসে তাঁকে বাতে ধরেছে। তোমাদের কিনুরামের প্রফুল্ল মুখ পুষ্ট শরীর দেখে তৃপ্তি লাভ করা গেল। সে আমার সঙ্গে কোন একটা বিষয়ে আলাপ করবার জন্যে বারম্বার ফিরে ফিরে আস্‌চে, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, কিন্তু আমাকে চিঠি লেখায় নিযুক্ত দেখে দুঃখিত মনে চলে যাচ্চে।

ষ্টীমারের অপেক্ষায় বসে আছি। বৈকালে শিলাইদহে চলে যাব।

কলকাতার নতুন বাড়িতে যে আলমারিতে বই আছে তার চাবি কার কাছে? তার থেকে গোটাকতক বই আমার দরকার।

কাল অর্দ্ধরাত্রে কল্‌কাতায় খুব ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। আমার যাত্রার আয়োজন আর কি। এখানে তিনচার দিন

বৃষ্টি নেই— রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করচে— গরম নিতান্ত মন্দ নয়। শিলাইদহে পোঁছে হয় ত দেখ্‌ব— পাট পচার নিস্তব্ধ দুর্গন্ধে সেখানকার বাতাস পরিপূর্ণ।

ওল তোমার মাকে দিয়েছি। সত্যকেও দিয়ে এসেচি। মনীষারা এতদিনে নিশ্চয় বোলপুরে গেছে। তোমরা খুব ব্যস্ত আছ বোধ হয়। খুব বেড়াতে যাচ্চ কি? জগন্নাথ মনীষাদের হাত দিয়ে তোমাদের কাপড় চোপড় ফলমূলমিষ্টান্ন ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়েছে বোধ হয়।

আজ খাওয়াটা বড় গুরুতর হয়েছে। তোমার মা কোনো-মতেই ছাড়লেন না— অনেকদিন পরে পীড়াপীড়ি করে মাছের ঝোল খাইয়ে দিলেন। মুখে কিন্তু তার স্বাদ আদবে ভাল লাগ্‌লনা। একটি ঠিকা ব্রাহ্মণ প্রত্যহ একটাকা বেতন দিয়ে সঙ্গে এনেছি। অল্প দিন থাক্‌ব তাই এত মাইনে দিয়ে আন্‌তে হল। ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে বিপিনের হাতের রান্না কি বলে খাই বল!

রথীর পড়ার যাতে কিছুমাত্র অনিয়ম না হয় সেইটে তোমাকে বিশেষ করে দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। এইখানে × × পূর্ব্বক বিদায় হই।

তোমার রবি

৩৫

[কালিগ্রাম। ১৯০২]

ওঁ

ভাই ছুটি

পথে অনেক বিঘ্ন কাটিয়ে আজ এখানে এসে পৌঁচেছি। প্রথমে ত দিন দুয়েক উল্টো বাতাস বইতে লাগ্‌ল— তাতে বোটের পক্ষে নড়া-চড়া অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। মৃদু মন্থরগমনে চল্‌তে চল্‌তে বিলের মধ্যে পড়া গেল। জান ত বিল সমুদ্র-বিশেষ— চারিদিকে জল থৈ থৈ করচে মাঝে মাঝে ডোবা ধানের মাথা ভেসে আছে— মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম এক একটা ছোট দ্বীপের মত জলের উপর জেগে রয়েছে— গোরুগুলোর চরবার জায়গা নেই— মানুষগুলোর নড়বার স্থান নেই— ডোঙায় করে ডিঙিতে করে এগ্রামে ওগ্রামে যাতায়াত— তোমরা বোলপুরের মত জায়গায় থেকে এ রকম দৃশ্য কল্পনাই করতে পারবে না। চারিদিকে শেওলা কল্‌মীর দাম ভাস্‌চে— মাঝে মাঝে পদ্ম ও নাল— সেই সমস্ত মিশে এক রকম গন্ধ পাওয়া যাচ্চে—জলে কালো কালো পানকৌড়ি— মাথার উপর মেছো চিল উড়ে বেড়াচ্চে। সন্ধ্যার সময় চারি দিকে যখন অকূল স্থির জল ধূ ধূ করে মনের ভিতরটা একরকম উদাস হয়ে যায়। সমুদ্রের জলের ঢেউয়ের বৈচিত্র্য এবং জলের শব্দ আছে— এখানে তাও নেই —চারিদিক নিস্তব্ধ শূন্য ছবি— তারি মাঝখানে কেবল পালে

বোট চলবার কুল্‌কুল্‌ শব্দ। এরি উপরে যখন ক্ষীণ জ্যোৎস্না এসে পড়ে তখন মনে হয় যেন কোন্‌ একটা জনহীন মৃত্যু-লোকের মধ্যে আছি। আমি বাতি নিবিয়ে দিয়ে জানলার কাছে কেদারা টেনে নিয়ে জ্যোৎস্নায় চুপচাপ্‌ করে বসে থাকি—এই বিশাল জলরাশির সমস্ত শান্তি আমার হৃদয়ের উপর আবিষ্ট হয়ে আসে। পর্শু দিন এই বিলের মধ্যে হঠাৎ পশ্চিমে ঘন মেঘ করে একটা ঝড় এসে পড়ল—বোটটা ভাগ্যক্রমে তখন একটা ধানের ক্ষেতের মধ্যে ছিল তাই তাড়াতাড়ি নোঙর ফেলে কোনমতে জলের তলার মাটি আঁকড়ে রইল। ঝড় ছেড়ে গেলে বোট ছেড়ে দিলুম—কিন্তু অদৃষ্ট এমনি খানিকটা গিয়েই আবার হঠাৎ ঝড়—সেবারেও দৈবক্রমে সুবিধার জায়গায় ছিলুম। নইলে বোট বাতাসে কোথায় ঠেলে নিয়ে ফেল্‌ত তার ঠিকানা নেই। এখানে এসেই খবর পেলুম আস্‌চে সোমবারেই আমাকে হাইকোর্টে হাজ্‌রি দিতে যেতে হবে—সুতরাং কালই আমাকে ছাড়তে হবে। কলকাতার শত সহস্র গোলমালের মধ্যে তোমাকে চিঠিপত্র লেখবার অবসর পাওয়া শক্ত তাই আজ এখানে বসেই তোমাকে লিখ্‌চি। এ ক'দিন জলের মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে সম্পূর্ণ নির্জ্জনতার মধ্যে নিঃশব্দে বাস করে আমার শরীরের অনেক উপকার হয়েছে। আমি বুঝেছি আমার হতভাগা ভাঙা শরীরটা শোধরাতে গেলে একলা জলের উপর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় নেই। লিখ্‌তে লিখ্‌তে আবার একটা ঝড় এসে পড়ল—তপ্‌সী

নোঙর টানাটানি করে ভারি গোল বাধিয়েছে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে বোধ হয় তোমাদের খবর পাওয়া যাবে।

তোমার রবি

[শিলাইদহ। ১৯০২]

ওঁ

ভাই ছুটি

শিলাইদহে এসে মনটা কেমন ব্যাকুল হয়। যাকে ছেড়ে যেতে হবে তাকেই বেশি সুন্দর দেখায় এই আমাদের মোহ। শিলাইদহের সঙ্গে সুখ এবং দুঃখ দুয়েরই স্মৃতি জড়িত— কিন্তু সুখটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। অথচ শিলাইদহ এখন তেমন ভাল অবস্থায় নেই। শিশিরে সমস্ত ভিজে রয়েছে, বেলা আটটা পর্য্যন্ত কুয়াশা, সন্ধ্যার পরে হিম— কুয়ো এবং পুকুর দুয়েরই জল যাচ্ছেতাই— চারদিকেই ম্যালেরিয়ার ধূম— আমরা ঠিক ['সময়ে'] শিলাইদহ ত্যাগ করেছি—নইলে ছেলেদের নিয়ে ব্যামো হয়ে বিপদে পড়তুম। বোলপুর এর চেয়ে ঢের বেশি নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর। কিন্তু গোলাপ যে কত ফুটচে তার সংখ্যা নেই। খুব বড় বড় ভাল ভাল গোলাপ। বাবলা ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। পুরাতন বন্ধু শিলাইদহ এই চিঠির সঙ্গে তোমাকে তার কয়েকটা বাবলা পাঠাচ্ছে।

এখান থেকে মুগ কলাই গুড় বইয়ের বাক্স যা যা পাঠিয়েছে পেয়েছ ত ? মুগ কলাই প্রভৃতি সমস্ত স্কুলের জন্য। ছোলা হলে ছোলা পাঠাবে।

রথীকে আমি উচ্চতর জীবনের জন্য আমি প্রস্তুত করতে চাই— সুতরাং নিয়ম সংযম এবং কৃচ্ছ্রসাধন করতেই হবে— যতই দৃঢ়তার সঙ্গে লেশমাত্র লঙ্ঘন না করে সে নিজের ব্রত সাধন করবে ততই সে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠ্‌বে। আমরা ত বাল্যকাল থেকে কেবল নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার দিকেই মন দিয়েছি— তার ফল হয়েছে বড় idea র চেয়ে, পরমার্থের চেয়ে, মনুষ্যত্বের চেয়ে, এমন কি প্রেম এবং মঙ্গলের চেয়েও আমাদের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাগুলোকেই আমরা বড় দেখি— কোনমতেই কারো জন্যেই কিছুর জন্যেই তাকে অল্পমাত্রও পরাস্ত হতে দিতে পারি নে— কাজের ক্ষতি করে ব্রত নষ্ট করে প্রিয়জনদের মনে গুরুতর আঘাত দিয়েও আমাদের অতি তুচ্ছ ইচ্ছাগুলোকে লেশমাত্র খর্ব্ব করতে পারিনে। নিজের ইচ্ছাকেই এইরূপ জয়ী হতে দেওয়া এটা বস্তুত নিজেকেই পরাস্ত করা, নিজের উচ্চতন মনুষ্যত্বকে নিজের দীনতার কাছে বলি দান দেওয়া— এতে যথার্থ সুখ নেই কেবল গর্ব্বমাত্র আছে। আমাদের যা হয়েছে বোধ হয় তার আর প্রতিকার নেই— এখন ছেলেদের নিজের হাত থেকে মঙ্গলের হাতে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে চাই— তিনি এদের ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, ইচ্ছার তেজ, প্রবৃত্তির বেগ, দশের আকর্ষণ অপহরণ করে মঙ্গলের ভাবে এবং সুকঠিন বীর্য্যে

ভূষিত করে তুলুন্। এই আমার কামনা—আমরা আমাদের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছাকে কঠিনভাবে সংযত করে ঈশ্বরের নিগূঢ় ধর্ম্মনিয়মের যেন সহায়তা করি—পদেপদেই যেন তাকে প্রতিহত করে আপনার অভিমানকেই অহোরাত্রি জয়ী করবার চেষ্টা না করি। এতেও যদি নিষ্ফল হই তবে আমার সমস্ত জীবন নিষ্ফল হল বলে জান্‌ব।× ×

রবি

কবিজায়া মৃণালিনী দেবী -কর্তৃক লিখিত

১

[শিলাইদা]

তোমাদের ছবি পেয়েছি। তোমারটা খুব ভাল হয়েছে তোমার যত ছবি আছে সবচেয়ে এইটে ভাল হয়েছে। খোকারটা তোমার মতন ওত ভাল ওঠেনি একটু সাদা হয়ে গেছে। তোমার মতন বড় করে আর চুলটা ভাল করে আঁচড়ে নেয়া হলে বেশ হোত।

[শিলাইদা]

বাবুর্চি না পাঠালে আর চলে না। তাকে পত্রপাঠ পাঠিও। কাল সাহেব আর না পেরে একটা পাঁঠা আনতে বলেছিল, নীতু পাখী শিকার করার জন্য অস্থির আমি থামিয়ে রেখেছি। সত্যি খাওয়া দাওয়া অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে একে রোজ মুর্‌গী তাতে নেহালের হাতের। সেই সঙ্গে সস্‌ ডেনিল ইত্যাদি বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করে যা যা দরকার পাঠিও। এখানে রাই ছাড়া আর কিছু নেই। পুডিং রোজ খাওয়া যায় না দু-একটা বোতলের ফল দাও তো বেশ হয়। লাহোরিণীর চাকরটাকেও সেই সঙ্গে পাঠিও পুটের অসুখ করেছে এবার আমাকে রীতিমত বিপদে পড়তে হবে। কিন্তু তাকে সেই গুল কড়ার করিয়ে পাঠিও।

১-২ সংখ্যক পত্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিত। বালিকা মাধুরীলতার পত্রে ধৃত।

৩

[১৯০২ ?]

ওঁ

বেলা

এতদিন পরে কাল তোমাকে কুলের আচার পাঠাতে পেরেছি। সুরেন বাড়ি ফিরে গেছে, তার কি এখন বেশীদিন থাকবার যো আছে। তার শাশুড়ি বলে দিয়েছেন রোজ তাঁদের বাড়ি যেতে। সুরেনের বৌয়ের ডাক নাম হচ্ছে "সতী", তোলা নাম "শতদল"। এবারে এনট্রেন্স পরীক্ষা দিয়েছে এখনও জানা যায় নি পাস হয়েছে কি না। মেয়েটি ধীর, শান্ত, ভাল মানুষ ও বুদ্ধিমতী। দেখতে খুব সুন্দরী নয় মাঝামাঝি। আমাদের বেয়ানটি হবে ভাল, বেশী বয়স নয় তা ছাড়া ভাল মানুষ এবং বেশ ধার্ম্মিক। বেয়ানকে আগেই জানতুম, W. C. বাঁড়ুয্যের ভাগ্নী। সুরেনের বিয়েতে যদি আমরা যাই তাহলে তোমাকে আনাবার ইচ্ছে আছে, যদি তোমাদের না আপত্তি থাকে। নঠাকুরঝি এখনও এখানে আছেন দুচার দিনের মধ্যে যাবেন। রাণীকে তিনি লিখতে ও বাজাতে শেখাচ্ছেন। তোমার ভাশুরের অন্যত্র থাকা কি ঠিক হোল? আজ উনি খাবার পর হঠাৎ বলে উঠলেন যে "চল তোমাতে আমাতে বেলাদের একবার দেখে আসি।" ইস্কুল নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন, নিজেই পড়াতে আরম্ভ করেছেন। রথীর জন্যে একটা ভাল ঘোড়া কিনেছি, সে তাতে চড়তে বড় সাহস করে না। মিস্ পারসেন আমাদের

কাছে কাজের জন্যে ফের উমেদারী করছে কিন্তু আমাদের স্থানাভাব তানইলে রাখা যেত। তোমাকে যে টেবিল ঢাকা দিয়েছে আমি ভুলে রেখে এসেছি, তবু তুমি একটু তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখ।

কন্যা মাধুরীলতা দেবীকে লিখিত

৪

[মে ১৮৯৩]

ওঁ

বাবা মহাশয়—

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনাদের যদি আসা মত হয় তা হলে আষাঢ় মাস থেকে এখানে আসবেন—এ মাসটা সেইখানেই থাকবেন। আমরা সব ভাল আছি। আপনারা সকলে কেমন আছেন লিখবেন। বাবামহাশয়ের জন্যে কচু আর নেবু যদি পারেন তাহলে পাঠিয়ে দেবেন। দিদিমাকে বলবেন যে রবিবার দিন অরুর একটী মেয়ে হয়েছে তারা সকলে ভাল আছে। আর তাঁকে বলবেন যে এখানে আসতে তিনি ওখানে থাকলে সেরে উঠতে পারবেন না। আমার প্রণাম জানিবেন।

মৃণালিনী

৫

ওঁ

বাবা মহাশয়,

নগেন্দ্রর চিঠি পেয়েছি। আমাদের এখানে আজ তিন চারদিন থেকে দিনরাত ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। আপনাদের ওখানেও কি বিষ্টি হচ্ছে? আমরা সকলে ভাল আছি। আপনারা কেমন আছেন লিখবেন। আমার প্রণাম জানিবেন।

মৃণালিনী

পুঃ এর মধ্যে যদি কোন লোক আসে তো তার সঙ্গে কচু ও কলম্বানেবু পাঠিয়ে দেবেন কিংবা ডাকে পাঠিয়ে দেবেন— অনেক দিন থেকে বাবামহাশয় কচুর কথা বলেছেন। দিদিমার জন্যে একটা চিঠি দিলুম তাঁকে পড়ে শুনিও।

ওঁ

বাবামহাশয়—

আপনার চিঠি পেলুম। আতু দিদির অবস্থা শুনে বড় দুঃখিত হলুম— তিনি কেমন আছেন লিখবেন— তিনি মরবার আগে তাঁকে একবার দেখতে পেলুম না— সেইটে ভারি দুঃখের বিষয়— আপনার যতটা সাধ্য তাঁর সেবা করবেন— তিনি আপনাদের অনেক করেছেন— আমরা সব ভাল আছি— আতুদিদিমাকে আমার প্রণাম জানাবেন।

মৃণালিনী

৪-৬ সংখ্যক পত্র মৃণালিনী দেবীর পিতা বেণীমাধব রায়চৌধুরীকে লিখিত

সত্য

আগেকার যে পঞ্চাশটাকা আমার নামে সরকারীতে হাওলাত আছে আর সে দিন যে চল্লিশটাকা নিয়েছি এই নব্বুই টাকা এ মাসে কেটে নিওনা। আগামী মাসে কেটে নিও। এমাসে কেটে নিলে আমার খরচ চলা অসম্ভব।

মৃণালিনী

মাসকাবারী কবে বেরোবে? আমার টাকাটা আজকেই দিতে বলে দিও— আমার কাছে মোটে টাকা নেই।

কবির ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

৮

[১৮৯৮]

ওঁ

চারু

অনেকদিন পরে তোমার একখানা চিঠি পেলুম। তোমার স্থন্দর মেয়ে হয়েছে বলে বুঝি আমাকে ভয়ে খবর দাওনি পাছে আমি হিংসে করি, তার মাথায় খুব চুল হয়েছে শুনে পর্য্যন্ত "কুন্তলীন" মাখতে আরম্ভ করেছি, তোমার মেয়ে মাথা ভরা চুল নিয়ে— আমার ন্যাড়া মাথা দেখে হাঁসবে সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। সত্যিই বাপু আমার বড় অভিমান হয়েছে নাহয় আমাদের একটি স্থন্দর নাতনী হয়েছে তাই বলে কি আর আমাদের একেবারে ভুলে যেতে হয়, তোমার মেয়ের সঙ্গে দেখছি আমার একচোট্ ঝগড়া করতে হবে, রমার সঙ্গে আমার ভাব আছে সেইজন্যে রমার চেয়ে তাকে কেউ স্থন্দর বল্লে আমার ভাল লাগে না,— নিশ্চয়ই রমারও সেজন্য মনে মনে একটু রাগ হয়। যাই হোক্ বাপু লোকে বলছে এই মেয়েই স্থন্দর হয়েছে রমার আর আমার মত তা নয়, এখন তোমার কি মনে হয় তা লিখো। রমা তার বোনকে নিয়ে কি করে আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে করে সে কি সারাদিনই তাকে নিয়ে থাকে? তোমার চিঠিতে কোন খবর পাবার যো নেই— এবারে লিখো— রমা কি করে কি বলে কেমন আছে সব লিখো— আর ছোট মেয়েটির কথাও সব লিখো— যদিও তার সঙ্গে আমি ঝগড়া করেছি তবুও সে কি

করে, কেমন হয়েছে, কি রকম আছে, দুষ্টু কি শান্ত সব লিখো, তাকে আমি অনেক দিন দেখতে পাব না বলেই তো তার সঙ্গে ঝগড়া করছি। সেজ বউরা কেমন আছে তাদের কোন খবর জানিনে যদি খবর পেয়ে থাকো তো লিখো। শুনছি নরুরা শীগ্‌গির কাশী যাবে— তোমার দেখছি তাহলে বড় একলা মনে হবে বাড়ীর মধ্যে তাহলে তুমি আর নদিদি, সেজদিদিরা তো আলাদা মহলেই থাকেন। তোমার বোন্ তরু এসেছিল কি? তোমার কাছে এখন কে দাসী আছে? প্রসবের সময় কষ্ট পাওনি তো? এখন কী রকম আছ? তোমাদের প্রত্যেক খবর দিও— তুমি জাননা আমার কতটা জানতে ইচ্ছে করে। তুমি যে দই খেতে চেয়েছ সেটী তো এখন হবে না—তুমি দই খাবে আর আমার নাতনীটী কাশতে আরম্ভ করবে, সে হবে না। যখন সে দুধ খাবে না তখন বোলো অনেক দই পাঠিয়ে দেব, উনি বলছিলেন "তা পাঠিয়ে দাওনা—সুধী খেতে পারবে" আমার বাপু সে পছন্দ হোল না, ছেলে খাবে বউ খাবে না— সে কি হয়। বিশেষতঃ তুমিই আমাদের লক্ষ্মী বউ— সব বউদের মুখ উজ্জ্বল করেছ, আজকাল তোমার ছাড়া আর তো কারো সুন্দর ছেলে মেয়ে হয় না। একটি কাজ কোরো ভুলো না— সত্যকে বলে রেখো যখন কেউ লোক আসবে কিংবা যদি নতুন ঠাকুর আসেন তোমাকে বলে যেন— তুমি রমা রাণীর আর খুকুমণীর দুজনকার দুটো গায়ের মাপ অবিশ্যি করে পাঠিয়ে দিও, খুকীর [উপরের] দিকে খোলা হবে কি বন্ধ হবে তাও বলে

দিও। কি এককাজ কোরো যদি বালিগঞ্জের দরজি যায় তার কাছে দিও, বোলো যে আমার দরজি যেদিন আসবে তার কাছে দিতে, কিন্তু ছোট কি বড় কিছু যদি বদলাবার থাকে আমাকে লিখে দিও। রমার মল কি তৈয়েরী হয়েছে? যদি তৈয়েরী হয়ে থাকে কত মজুরী লাগল— বোলো পাঠিয়ে দেব আমি তখন তাড়াতাড়িতে দিতে পারিনি, যদি না হয়ে থাকে তো তাড়া দিয়ে করিয়ে দিও। সুধীর কি খবর? হাইকোর্টে যায়? এখন কি তার প্রাকটিস্ করবার সময় হয়েছে কোন কেস্ পেয়েছে কি? পুটেকে বোলো সে যেন আমার কাছে থাকবার আশা না করে, আমি বেশ আছি সে যেয়ে অবধি ঝগড়া লাগালাগি কাকে বলে জানিনে, সে তো নদিদির কাছে থাকতে পারে তাতে তো আমার কোন আপত্তি নেই আর তা ছাড়া আমার আপত্তি থাকলেও তাতে তো তাঁদের রাখা আটকে থাকবে না। আমরা সব ভাল আছি, আজ কদিন থেকে খোকার সর্দ্দি জ্বর হয়েছিল আজ স্নান করবে সেইজন্যে তোমাকে এ ক'দিন লিখতে পারিনি। তোমরা আমার ভালবাসা জানবে।

মৃণালিনী

[১৮৯৮]

ওঁ

চারু,

তোমার চিঠি ও রমার কাপড় পেয়েছি। কিন্তু এ কয়দিন গোলমালে উত্তর দেওয়া হয়নি, কাল বলু যাচ্ছে এখন সন্ধে হয়েছে তাড়াতাড়ি এইটুকু লিখছি। রমারাণীর কাপড় পেলুম আর আমার ভাগ্যদোষে এই সময়েই দরজি অসুখ করে বাড়ী গেছে আর একটা দরজি পাঠাতে বলেছি দেখি কি হয়, আমার ইচ্ছে করে রমারাণী আমার কাপড় পরে বলবে দিদিমা দিয়েছে সেইটে বড় শুনতে ইচ্ছে হয়। তার জন্যে একটা লাল ঝাপলা দিলুম তাকে এইটে পরলে বেশ টুকটুকে দেখাবে সেই মনে করলে আমার খুব আনন্দ হয়। ছোটরাণীর জন্যে তাঁর পূজনীয় ছোটকাকামহাশয় তাঁর নিজের দুটি কাপড় পাঠালেন। আমি তার জন্যে কিছু পাঠাতে পারলুম না বলে বড় দুঃখু হচ্ছে দরজিটা এলে বাঁচি। তোমার জন্যে দুখানা আমশত্ত পাঠালুম দুধ দিয়ে খেও এতে কোন অসুখ করবে না। আর এক রকম চাল পাঠালুম এর একদিন দুধে দিয়ে পরমান্ন করে খেও বেশ হয়—সেরখানেক দুধে দু-চামচ তিন চামচ দিলে ঠিক হবে আগে জল দিয়ে সিদ্ধ করতে বোলো সেই সময়ে খুব নাড়ে যেন। আজ আসি। বড় ও ছোট রাণীকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাবে। আমশত্ত দুখানা রোদ্দুরে দিও।

৮-৯ সংখ্যক পত্র কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী চারুবালা দেবীকে লিখিত

১০

[শান্তিনিকেতন। ১৮৯০]

ওঁ

সুকুমার

সন্দেশ, মোরব্বা, বাতাসা পেয়েছি, বাতাসা দেখে আমরা সকলে অবাক্ হয়েছি, এত বড় বাতাসা কখন দেখিনি। সন্দেশ আমাদের বেশ লাগল, মোরব্বা নিশ্চয়ই খুব ভাল হবে। আমাদের এখানে খাবার বন্দবস্ত তো জানই মাছ মাংস খাবার যো নেই এ রকম অবস্থায় এ রকম সব উপহার পেলে কি রকম খুসী হবার কথা সে বলা বাহুল্য। সুশীলা, সুধী, কৃতী, দিনু, নলিনী এখানে আছে, আমাদের দলটি বেশ জমেছে। আমরা মনে করছিলুম যে তুমি হয়ত এদিক্ দিয়ে একবার হয়ে যেতে পার। আমরা তোমাকে চিঠি লিখব মনে করছিলুম তোমার ওখানে যাবার জন্যে, কিন্তু শেষকালে দেখলুম ছেলেদের রেখে যেতে সুবিধে নেই।

মৃণালিনী

কবির ভাগিনেয়ী সুপ্রভা দেবীর স্বামী সুকুমার হালদারকে লিখিত

সংযোজন

মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
পত্রাবলী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত

ওঁ

কাকী মা

এবার ত তাহলে তোমাদের মেলা চুকে গেল। কিন্তু আমরা এখনও চোকাতে পারলুম না। কথা ছিল শুধু একটি সাবালক ডেপুটি আসবেন, কিন্তু অদৃষ্টগুণে রবিকাকা যাকে আসতে বলেন তারই একটি করে 'আধখানা' এবং গুটি দুই তিন 'গুঁড়ো' জুটে যায়। শুনচি, ডেপুটি সাহেব পূর্ণাঙ্গে এবং কাচ্ছা বাচ্ছা সমেত আমাদের এখানে এসে উদিত হবেন। ইতিপূর্ব্বে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের একবার আমদানি হয়েছিল তার বৃত্তান্ত অবগত আছ, এবারে ডেপুটি কাহিনী শুন্‌তে পাচ্ছ। কাকীমার আসা উচিত ছিল। দেখ দিকি তারা এসে যখন তোমাকে খুঁজবে তখন আমরা কি জবাব দেব। প্রজ্ঞা অভিদের আজ থেকে মুখস্ত করান হচ্ছে ডেপুটিনীকে কি বলবে কইবে। প্রথম প্রশ্ন, তোমার নাম কি গা? তা'পর স্বামীর নাম কি? এর উত্তর শুনবে দিনের উল্‌টো— সে বেচারী ত নাম ধরতে পারবে না। তৃতীয় প্রশ্ন, তাঁর বেতন কত? তা'পর চতুর্থ পঞ্চম, আহা উহু ওমা ঘরের লোক ইত্যাদি যেমন দরকার হবে তাই বুঝে। এই ত ব্যাপার। কেবল তুমি নেই বলে বড় জম্‌ছে না। প্রতিবারে কাকীমা লোকজনের ভার পরের কাঁধে চাপিয়ে তা'পরে খালি ছাঁকা খবরের আরামটা উপভোগ করা বড় অন্যায় কিন্তু। ডেপুটি যখন বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করবে তখন ডেপুটিনী কি উত্তর দেবে বেচারা?

এদিকে এই, ওদিকে কলকাতা থেকেও নানা কথা শুনতে

হচ্ছে। রবিকাকা কারও কাছ থেকে তাড়া খেয়ে কৈফিয়ৎ লিখছেন। সাধনা সম্পাদক অধম আমার প্রতি লেগেছেন— কিন্তু আমি বিশ্বস্তসূত্রে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে যা শুনলুম তাতে অনেকটা ঠাণ্ডা আছি। এইবেলা দিন থাকতে কাকামা একটা কিছু বিহিত বিধান কর। যদিও মধ্যম-নারায়ণের দরকার হয় তা' লিখলেই হবে— এখানে একজন বেশ ভাল কবিরাজ আছে। নীদ্দা যে সত্ পরামর্শ দিয়েছিলেন তা শুনলুম। হাজার হোক্ জ্যেষ্ঠ কিনা— আঁচে বুঝে নিয়েছিলেন বোধ হয়। তাঁর উপদেশ মেনে চল্লে সম্পাদক মশায়ের এ দুর্দ্দৈব ঘট্‌তো না।

মাঝে থেকে যশ আর জ্ঞান দুই ভাই তাড়া খেয়ে এল। জ্ঞানচন্দ্র ত খুব রসিকতা করেছিলেন, তাড়ার বেশি যে খান নি এই ভাগ্যি। বেচারা যশকে দোষ দেওয়া যায় না। ওর কি মাথার ঠিক ছিল ? ড্রপসিন ফেলে লোকের হাত ভেঙ্গে দেবে তাতে আর আশ্চর্য্যি কি। নীদ্দার কাজ নিদ্দারই পোষায়— তাঁর হাত পেকে এলো। ছেলেমানুষদের দিয়ে ওসব করা কেন ?

কলকাতায় শুনছি কাকীমা গরম পড়েছে। এখানে কাল থেকে আবার শীত পড়েছে। আমরা গরম পড়লে বেঁচে যাই— সবাই হাঁ করে আছি। আজকাল দুপুর বেলায় খুব হাওয়া দেয়—আর নদী তোলপাড় করে। কিন্তু এমনি বালি ওড়ে যে নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না।

একটা নতুন খবর দিয়ে রাখি শোন। রবিকাকা সেদিন হঠাৎ টের পেলেন যে, তিনি পার্লামেন্টের সম্পাদক ছিলেন। খবরটা আগে জানতে ?

আজ কি বৌঠানরা আসছেন ? রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার কি করছেন। বেলির মধ্যে মধ্যে বড় বড় চিঠি আসে শুনতে পাই।

ডেপুটিরা চলে গেলে এখানকার বিস্তারিত বিবরণ পাবে কাকীমা।

বলু

অভিজ্ঞা দেবী -লিখিত

১.

ওঁ

শিলাইদা

৪ঠা ফাল্গুন সোমবার

ভাই কাকী মা

মেয়েরা তোমাদের কাছে কেন যে তুষ্টু হয় তা বলতে পারি নে।

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। কিন্তু তুমি আমার নামে বড় বদনাম তুলে দিয়েছ যে তোমার আমি নিন্দে করি। আমি কখনও নিন্দে করতে পারি কাকীমা ? তোমার নিন্দে করি কি প্রশংসা করি সে কথা বোলতাকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবে। [আমি সাক্ষী হতে পারবো না] আমাকে এতটুকু বিশ্বাস হোলো না ? এত কি খারাপ যে নিন্দে ছাড়া থাকি নে ? চিঠিতে লিখলুমনা বলে মনটা··· । বড় মজার লোক··· এখানে আমাকে খুব অস্থির করে তোলেন আবার তার উপর তুমি লাগলে তো আমি পেরে উঠব না। আমি পাগল হয়ে যাব। [আগে থেকেই

অনেকটা]। তুমি ভাই আমার চিঠিটা কেবল বাজে কথা দিয়ে পুরিয়ে দিয়েছো। [সাধে !] সখি সমিতিতে কে কি সাজবে তা আমার শুনে কি দরকার বল। আমার তো এবারে সাজতে হবে না তাহলেই হোলো। আমি খুব বাঁচন বেঁচে গেছি। এই বয়সে এক্‌টিং করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। সুইদা বেচারার ভারি কষ্ট তিনি সবে ইনফ্লুয়েন্‌জা থেকে উঠেছেন। তাঁর কত ভার পড়েছে। একদিকে সাধনার ভার সখিসমিতির···। তিন দিন খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে প্রম্‌ট করা ষ্টেজ ম্যানেজ করা ভয়ানক হয়ে উঠবে। বোধহয় তিনি পেরে উঠবেন না [খুব পারবেন] আমার তো বাপু ভারি মায়া করে। তুমি বোলতাকে লক্ষ্মী ছেলে বলেছ ! কে না বোলতাকে লক্ষ্মী ছেলে বলে— সকলেই বলে। তুমিও বল আমরাও বলি। বোলতা ছুবেলা আমাদের বেড়াতে নিয়ে যান্। তুমি আরবারে এসে যে চরের উপর পথ হারিয়েছিলে আমরাও তার উপর এখন বেড়াতে যাই। সেবারে তোমার সঙ্গে শশাংক ছিল। বোলতা বলেন তোমাকে নিয়ে তিনি অস্থির হোয়ে পড়েছিলেন। [অসাক্ষাতে নিন্দে নয় ?] তুমি যেখানে যেখানে কাটি পুঁতেছিল [সেখানটা] দেখলুম। সেই সব কাটির চিহ্ন [আর তোমার] জুতোর খুরের চিহ্ন দেখে রবিকাকা বলে উঠলেন আমার এই সব চিহ্ন দেখে বড় কান্না পাচ্ছে। আমি [বল্লুম] আর কেঁদনা আর কেঁদনা ছোলা ভাজা দেবো বলে অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগলুম। তবে চুপ করেন। রবিকাকা আজ থেকে ঘি খেতে আরম্ভ করেছেন। বড় লক্ষ্মী। [না হয়ে করেন কি ? পারলে তো ?] কিছু পেড়াপীড়ি করতে হয় নি। যেমন শুনেছেন তোমার হুকুম অমনি

কিন্তু ধরেছেন। এখানকার নায়েব আমাদের বেল কাঁঠাল ইত্যাদি সব খাবার জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছে। রবিকাকা সেগুল তোমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন। তার সঙ্গে কতকগুল পেয় [ারা] আর পাবদা মাছ সোদ্দার জন্য দেবেন। পাবদা মাছ আমার খুব ভাল লাগে। রোজ পাবদা মাছ আসছে। আজ তবে এই পর্য্যন্তই থাক। বেলা কেমন আছে লিখো। প্রণাম করে আসি তবে। ইতি—

তোমার স্নেহের অ

পত্রমধ্যে [ ] বন্ধনীবদ্ধ কথাগুলি 'বোল্‌তা' ওরফে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত মন্তব্য।

২.

ওঁ

মঙ্গলবার

কাকিমা ভাই,

এমনি করে কি মানুষকে চিঠি লিখতে হয়। একখানা কাগজ পাও নি? ছেড়া আধ খানা পাতে লিখেছ। আমাকে লিখলে আমি কিছু মনে করলুম না। আর একজনকে লিখলে বোধ হয় তোমার চিঠি পছন্দো করতো না রেগে ছিঁড়ে ফেলতো। আমরা বিদেশে আছি কাগজ কলমের অভাব হয়। তোমাদের কিসের অভাব বলো? মনে করলেই কাগজ কলম পেতে পার। এবারে সুইদাও আমাকে এক ছেঁড়া কাগজে চিঠি লিখেছেন। আমি তাঁর উপর এবার বড় রাগ করেছি।

তুমি ভাই রবিকাকাকে চিঠি লেখ না কেন বল দেখি। একদিন চিঠি না পেলে রবিকাকা ভেবে অস্থির হন। তোমাকে তিনি রোজ একখানা করে চিঠি লেখেন আর তুমি কিনা মনে পড়লে তবে লিখবে। বড় অন্যায়। বেচারা রবিকাকা সব সহ্য করে থাকেন। কাউকে কিছু বলেন না। আমার বাপু বড় মায়া করে। রোজ সন্ধ্যা বেলায় আমাদের কাছে কত দুঃখু করেন। কাকিমা তুমি অনায়াসে একখানা করে রোজ সকালে কিম্বা রাত্তিতে বসে চিঠি লিখতে পার। এ তো পাঁচ মিনিটের কাজ এটুকু সময়ও কি পাও না? তুমি লিখেছ "আমি এখন কাজের লোক হয়ে পড়েছি" একেই কি কাজের লোক বলে? এটাও একটা মস্ত কাজ তা তুমি জান? সকল কাজ ছেড়ে আগে তোমার একাজ করা উচিৎ। এটা তোমার কর্ত্তব্য কাজ। কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করতে নেই। রবিকাকা দুদিন উপরি উপরি তোমার চিঠি পেয়ে ভারি খুসীতে আছেন। তিনি খুসীতে আছেন দেখলে আমাদের বেশ মনটা খুসী হয়। খুসীর চোটে নাচ গান করেন। দেখতো কাকিমা এরকম শুনতে তোমার ভাল লাগে না? রবিকাকা বলেন আমি রোজ চিঠি লিখে মরি আর একজন লোক বিদেশে আছে কেমন আছে তার কেউ খবর নেন না। ভারত উদ্ধার করতে যান কিন্তু আমার দশা যে কি হচ্ছে তার দিকে একবার চেয়েও দেখেন না? সত্যি বলছি রবিকাকা যখন এইসব বলেন তখন তোমার উপর আমার ভারি রাগ হয়। তোমার ভাই একটুও দয়ামায়া নেই তা বলছি। যাকগে ওসব কথা। আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি নে। এবার থেকে কিন্তু রোজ রোজ রবিকাকাকে চিঠি লিখো।

কাকিমা, আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে না। বোলতার কথাই বিশ্বাস কর। কিন্তু আমি বাপু সত্যি কথা বলছি শোন। আমি বোলতাকে চিঠি দেখালুম, তিনি বল্লেন আমি এর মাঝে মাঝে টীকে করি দাও। আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলুম না। তবে একজন মানুষ নেহাৎ পেড়াপীড়ি করলে আর কি করি বল। লিখতে দিলুম, আর বল্লুম কিছু বানিয়ে লিখো না। তিনি বল্লেন তবে আর কি হল বেশ একটু মজা হবে সেই তো ভাল। কাকিমা কি লেখেন দেখা যাবে। বলে তিনি বানিয়ে লিখে দিলেন। আমি জানতুম তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। বোলতার লেখাটুকু দেখেই বিশ্বাস করবে ভেবেই আমি তাঁকে লিখতে বারণ করেছিলুম। আমি সত্যি কথা বল্লেও আমার কথা বিশ্বাস হয় না। তা বাপু বিশ্বাস করবার দরকার নাই। আমার কপাল মন্দ তার আর কি করব বল। কেউ বিশ্বাস করেন না কেউ চিঠি লেখেন না ইত্যাদি।

বোলতার রুমাল রোজ ভিজে থাকে বটে। আমি জানতুম না যে তিনি কাঁদেন। তোমার চিঠিতে দেখলুম, এবার থেকে তাঁকে নানা কথা বলে, পাখী দেখিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখবো। আজ তোমার চিঠিটা যখন বোলতাকে শোনাচ্ছিলাম তখন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি চোখদুটো জলে পুরে এসেছে। দেখে তাড়াতাড়ি চিঠিটা মুড়ে ফেল্লুম। রবিকাকার বাদাম ছাড়িয়ে দিতে হয়। এখন সময় হয়েছে, কাজ সেরে সুরে এসে আবার লিখতে বসবো।

ভাই কাজ কর্ম সারা হল সন্ধ্যেও হয়ে এল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

বোলতারা বেড়াতে যাবেন। আমি আজ বেড়াতে যাব না। কি করি একলা বসে তাই তোমাকে চিঠি লিখছি।

আমরা রোজ সন্ধ্যে বেলায় বেড়িয়ে-টেড়িয়ে এসে বড় বোটে আড্ডা করি। কোন কোন দিন গান বাজনা হয়। কাকিমা ভাই তুমি এলে বেশ হোতো।

হু-তিন দিন হোলো ছোট বোটের সঙ্গে সমস্ত দিন আমাদের কোন সম্পর্ক থাকে না কেবল রাত্তিরে যা আমরা শুতে যাই। সে বেচারা একলা চরের ধারে পড়ে থাকে। বোলতাতে মেজদিতে ছোট বোটটা ভারি পছন্দ করেন। আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি বড় বোটটা বেশ পছন্দ করি। এখন মেজদিরা সারাদিন বড় বোটে থাকেন। পদে এসেছেন। এখন বলতে হয়েছে বড় বোটটা ভাল।

রবিকাকা বলছেন এখানে বেশ আছি কলকাতায় যাব না। বছরখানেক থাকলেও থাকতে পারি। আমরা গিয়ে তোমাদের কত বদল দেখবো। তোমরাও আমাদের অনেক বদল দেখবে।

স্থইদার হাতে পড়ে এবারে সখি সমিতির আচ্ছা অবস্থা হয়েছিল। আচ্ছা ছেলেমানুষি কাণ্ড যাহোক। একজন বড় না থাকলে কি চলে। অন্যবারে রবিকাকা থাকতেন কোন গোলমাল হোতো না। সখি সমিতি কি রকম হলো সব লিখো। আমরা একখানা বিবাহ উৎসব পেয়েছি। রকিকাকা যেরকম করেন হাঁসতে হাঁসতে দম আটকে যাবার যোগাড় হয়। তুমি থাকলে কিছুতেই না হেঁসে থাকতে পারতে না।

আজকাল গরম পড়েছে। শীত এক পা তুই পা করে সরে

যাচ্ছেন। একেবারে গরম পড়লে বেশ হয় দরজা খুলে দিয়ে শোয়া যায়। চরের উপর চৌকি পেতে বসে গল্প সল্প করা যায়, বেশ লাগে। বোলতা আজ আবার আমার চিঠি পড়ে দু একটা কথা লিখতে চাইলেন, কিন্তু আজ আর আমার দিতে সাহস হলো না। সে কেবল তোমার জন্যই কাকিমা। আর ভাই লিখতে পারছিনে। এবারে খাবার দাবারের উপায় দেখি গে। আমারও মনটা সেই দিকেই ছুটছে। তবে ভাই আজ আসি। বেলারা কেমন আছে লিখো। প্রণাম ইতি

তোমার স্নেহের অভি

৩.

ওঁ

শিলাইদা

মঙ্গলবার

ভাই কাকিমা,

সকলের চিঠিতে কেন আমাকে দুষ্টু মেয়ে বলেছ? তোমার কাছে কি দুষ্টুমি করেছি বল? যদি কিছু করে থাকি তার জন্য মাফ চাচ্ছি বাপু।··· এরকম জানলে কখনও লিখতুম না। তুমি ভাই আমাকে এ পর্যন্ত দুষ্টু ছাড়া লক্ষ্মী বল্লে না। সকলেই তোমার কাছে লক্ষ্মী আমি বেচারা কি দোষ করলুম।··· নরু বৌঠানকে বলো আমি ভাল ভাল অনেক গান শিখেছি। নরু বৌঠান শুনে একেবারে গলে যাবেন। বোলতা আজকাল দিনরাত গান গাচ্ছেন। বেড়াতে খেতে শুতে বসতে। গান গাইতে গাইতে

দেখি তাঁর দুই চক্ষু জলে ভেসে যায়। আমরা জিগেস করলে কিছু বলেন না। আজও পর্য্যন্ত আমরা বোলতার মনের ভাব তো কিছু বুঝতে পারলুম না।··· কিন্তু আমার বড় কষ্ট হয়। কাকীমা আমি রবি কাকার কাছে অনেক গান শিখেছি।··· বাস্তবিক বলছি তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আমি রবিকাকাকে প্রায় বলি কাকিমা খুব লক্ষ্মী মেয়ে। রবিকাকা শুনে খুব খুসী হন।

রবিকাকা কি স্বপ্ন দেখেছিলেন বলছি শোন। বল্লে তোমার বোধহয় কারোর উপর হিংসে হবে। ওসব কথা গোপন করে রাখা কিছু না। কি বল ভাই বলে ফেলাই ভালো। কর্ত্তা দাদামশায় বিয়ে দেবেন। রবিকাকা কিছুতেই বিয়ে করবেন না। কর্ত্তাদাদা-মশায় ছাড়বেন না। কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। যেমনি বিয়ে হবে অমনি রবিকাকার ঘুম ভেঙ্গে গেল। যাক্ তুমি বেঁচে গেলে। তোমাকে আর সতীনের ঘর করতে হল না।··· মাঝে মাঝে দুই একটা সতীন হলে তোমার বোধহয় ক্ষতি হবে না। মেয়েটি দেখতে শুনে [শুনতে] কিন্তু বেশ ছিল। তবু ভাই রবিকাকা তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারেন না। দেখতো তোমাকে কত ভালবাসেন।

তুমি রবিকাকাকে রোজ চিঠি লিখবে বলে লিখলে কৈ? রবিকাকা এ দুদিন তোমার চিঠি পান নি। আজ আবার কত দুঃখু করছিলেন। তুমি ভাই লিখেছিলে বলু কাঁদলে তাকে সান্ত্বনা দিস। আমি কত বুঝিয়ে বলি কিছুতেই বোঝেন না। আর কোনো খবর নেই। ইতি

স্নেহের অভি

ভাই কাকিমা,

আমরা আজ শিলাইদা এসে পোঁছেছি। পদ্মার সঙ্গে অনেকক্ষণ খেলাধূলা করে তবে আসা গেছে। তুমি বোধ হয় পদ্মার সঙ্গে খেলা করাটা শুনে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এবিষয়ে বোলতার কাছ থেকে খবর নিতে পার। দুপুর বেলাটা এইরকম খেলাতেই কেটে গেল, তারপরে শিলাইদাতে এসে রবিকাকা কাছারিতে গেলেন আর আমরা ছোট বোটটা নিয়ে উল্টো পারে এসে তিনজন বেড়াতে গেলুম। তোমার বিষয় কত কথা হলো। খানিকটা বেড়িয়ে বাড়ী ফেরা গেল। বাড়ীতে এসেই একটা··· হল সেটা··· ভাই আমি তোমাকে চিঠিতে লিখতে পারবো না বাড়ীতে গিয়ে বলা যাবে। তুমি আমার চিঠি পেয়ে একটু আশ্চর্যি হয়ে যাবে— না? তুমি কখন মনেও করনি যে আমি আবার তোমাকে চিঠি লিখবো। নিশ্চয়ই বোধ হয় বল যে অভি যে কুঁড়ে সে আবার কাউকে চিঠি লিখবে। তোমাদের এই বিশ্বাসটা মন থেকে তাড়িয়ো না। তাড়ালে আমার পক্ষে কিছু অসুবিধে হ'তে পারে। যাক্‌গে ওসব কথা— এখন লক্ষ্মী মেয়ে হয়েছি কি না বল। দু'তিন দিন হল আমি বিবিকে বোলতার চিঠির ভিতর একটু লিখেছিলুম। একটা বড় চিঠি পাব মনে করে বসে আছি তো কি হয় কি জানি যাঁদের কখন চিঠি লিখিনি তাদের প্রথমে চিঠি লিখতে বড় লজ্জা করে। সুইদাকে প্রথম চিঠি তখনও অনেক কষ্টে চোখনাক বুজে লেখা গিয়েছিল। সুইদা এখন কেমন

আছেন ? বেশ সেরে উঠেছেন তো ? নরু বৌঠান মুরাদাবাদ থেকে ফিরে এসেছেন ? আর কি লিখবো ভাই— দশটা বেজে গেছে সকলে শুতে গেছেন। আমিও তবে শুতে যাই। বাড়ির সকলে কেমন আছেন সব খবর লিখো। আজ তো আমরা মায়েদের কাছ থেকে একখানাও চিঠি পাই নি। তবে আর কি— সকলকে আমার প্রণাম দিও। বেলাকে আমার ভালবাসা দিও। আর তোমাকেও এইখানে প্রণাম করি। তবে আজ আসি ভাই। ইতি

তোমাদের স্নেহের অভি

নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত

ওঁ

সোমবার

কাকীমা,

অনেকদিন পরে আজ তোমার একখানা চিঠি পেয়ে কি পর্য্যন্ত যে খুসী হলুম তা বলতে পারি না— আমি অনেকদিন তোমাদের চিঠি লেখবার চেষ্টা করতুম কিন্তু কোন মতে পেরে উঠতুম না, লিখতে গেলে হাত কাঁপে, তার সাক্ষী এই লেখা দেখলেই বুঝতে পারবে। এখন আমার কোন অসুখ নেই, পায়ে ব্যথা সেরে গিয়েছে শুধু একটু জোর পেলেই হয়। লাঠি ধোরে একটু আধটু বেড়াতে পারি। তোমাদের ওখানে যাবার এখন কিছু ঠিক করি নি, রবিকাকার সঙ্গে যেতে পারি কিম্বা তার আগেও যেতে পারি কিন্তু আমি ভাবছি তোমাদের কোন অসুবিধা হবে কি না, আর কোন বিষয়

নয় ঘরেতে কি কুলবে ? একবার আমার সবাইকে দেখে আসবার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, তারপর চাই কি কাশী কি আর কোথাও গিয়ে থাকতে পারি। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে এ রকম আশা আমার মোটেই ছিল না যাহোক কোন রকম কোরে এ যাত্রা বোধ হয় পার পেয়ে গেলুম। রবিকাকা না এলে তো আর কোন কথাই ছিল না। তুমি, বেলা, রাণী আমাকে কিছুদিন আগে যে চিঠি লিখেছিলে তার একখানাও পড়তে পারি নি তখন অক্ষরগুলো কিছুই দেখতে পেতুম না— তবে মাঝে একদিন [কি একরকম] ঝোঁকে সেগুলো খোঁজ করেছিলুম। আর আমার এখানে এক দণ্ড থাকতে ইচ্ছে হোচ্ছে না। বড় পিসীমার বোধ হয় অসুবিধা হয়— এখন কোথায় যাই— সেইটে একবার ঠিক করতে পারলে হয়— তোমাদের ওখানে প্রথম যাব। তারপর কোথায় যাই ? শমী-বাবুকে দেখবার জন্যেও আমার মন বড়ই ব্যাকুল হোয়েচে, তার দুষ্টুমি কতটা এগিয়েচে ? c/o-র খবর কি ? জগদীশদা কি তাঁর ভাইপোর পদ পেয়েছেন ? আজ আর পারচিনা। জায়গাও নেই। ভরসা করি তোমাদের খবরাখবর দিতে দেরী করবে না।

নীতু

১.　　　　　　　　　ওঁ

বুধবার

শ্রীচরণেষু,

মা, তোমার চিঠি কাল পেলুম। নিতুদাদার কাছে প্রায়ই যাই। বোলপুর থেকে তেল, কদমা, খেলনা কিনে এনেছি। ওল পেলুম না। আজ সার্কাস দেখতে যাব। কাল বিসর্জ্জন হবে। কাল দেখতে যাব বলে আজ সেটা পড়ে রাখলুম। শুক্রবারে সব জিনিষ কিনতে যাব। শনিবারে বিবিদিদির জন্মদিন। বেলা যদি কিছু দেয় ও শীঘ্র পাঠিয়ে দিক্। নীদ্দার কাল রাত্তিরে ঘাম হয়ে জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। আজ সকালে ১০০। অন্যদিন ১০১ হয়। প্রতাপবাবুই দেখছেন। আজ সুহৃৎকে দিয়ে examine করবার কথা ছিল। তিনি এখন আসেননি। সাহেব কাল যাবে। সুশী বোঠান চিঠি লেখেন্না কেন? তাঁর উকুন হয়েছে বলে বোধ হয় খুব ব্যস্ত থাকেন তাই লেখা হয় না। আমরা সব ভাল। তোমরা কেমন আছ লিখ? ইতি

রথী

২.

ওঁ

Monteagle Villa.
18 November 1896
Tuesday

মা

আমি ভাইফোঁটা পেয়েছি।···

বেলা তার সঙ্গে একটা চিঠি লিখেছে, আর তাতে লিখেছে যে যেদিন আমি কাপড় পাব তার পরের দিন খাবার পাঠাবে কিন্তু আমি ত পাই নি। তোমার চিঠি অনেকদিন পরেও পেলুম না। আমাদের কলকাতায় যেতে আর বেশী দেরী নেই— এই পাঁচদিন আছে। এখানে আজকাল বরফ পড়ে— ঠিক নুনের মত ছোট গুঁড়ি? আর খুব ঠাণ্ডা। তুমি বলেছিলে যে আমাকে ঘাসের মধ্যে একরকম ফুল পাওয়া যায় সেইগুল আমি আনতে চেয়েছিলুম ত প্রতিভাদিদি বল্লেন ওগুল রেলগাড়িতে আনতে গেলে সব ফুলের পাতাগুল উড়ে যাবে, তাই বলে এক রকম ঘাসের ফুল নিয়ে যাচ্ছি। আমি তবে এইখানেই শেষ করি।

ইতি

রথী

৩.

ওঁ

কলিকাতা

শুক্রবার

শ্রীচরণেষু

মা, কাল রাত্তিরে এখানে এসে পৌঁছিয়েছি। গাড়ি খালি ছিল নৈহাটি পর্যন্ত তারপরে একটা গোরা জুটেছিল। কিন্তু সে সৌভাগ্যক্রমে সাহেবের বন্ধু ছিল। নীদ্দার কাশী কাল খুব কম ছিল। কর্ত্তাদাদামহাশয়ের কাছে গিয়েছিলুম। আজ বোলপুর যাচ্ছি। একটু মুস্কিল হবে যে পুল ১টা থেকে ৪টে পর্য্যন্ত খোলা থাকবে, ষ্টিমারে পার হতে হবে। ন মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ১২টা টাকা যে দিয়েছিলে তার ১০ টাকা ১৫ আনা রেল ও ষ্টিমার খরচ হয়েছে। ১ টাকা ১ আনা বাকি আছে। বাড়ির সবাই ভাল আছেন। তোমরা কেমন আছ লিখ?

ইতি

রথী

পরিশিষ্ট ১

মৃণালিনী দেবী প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ

১.　　　　　　　　　　　ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে। ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণ স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্ম্মের নিত্যসহায় হইয়া আমাকে বলদান করিবে।··· ইতি ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯

অনুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০, পৃ. ১০-১১

২.

···তোমার পত্রখানি পাইয়া আমার হৃদয় স্নিগ্ধ হইল। তুমি অল্পদিন এখানে থাকিয়াই তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছ। তাঁহার স্বভাব মাতৃভাবে পূর্ণ ছিল এবং তিনি তোমাকে আপন সন্তানের চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। এখানকার বিদ্যালয়ে তুমি আসিবে এবং তাঁহার যত্ন শুশ্রূষার অধীনে থাকিবে ইহার জন্য তিনি ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার কাছে থাকিলে কখনো মাতার অভাব একমুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করিতে পারিতে না ইহা নিঃসন্দেহ।

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন সেইশোককে তিনি নিষ্ফল করিবেন না— তিনি আমাকে এই শোকের দ্বার দিয়া মঙ্গলের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।

তোমার কল্যাণ-কামনা আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে— তুমি সকল বাধা বিপত্তি সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকো ; স্বদেশের হিতানুষ্ঠানের জন্য আপনার জীবনকে প্রস্তুত করিয়া তোল ইহাই আমি একান্ত চিত্তে কামনা করি। (১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯)

সত্যরঞ্জন বসুকে লিখিত

দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা', পৃ. ৮৭

৩.

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু,

ঈশ্বর আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন— এক্ষণে আমাকে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। আপনার দ্বারে আমার এই প্রার্থনা যে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একটি ছাত্রের ব্যয়ভার আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অধিক নহে, বৎসরে ১৮০ টাকা। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে যদি এই টাকাটি দেন তবে তাহা আমার পরলোকগতা পত্নীর মৃত্যুবার্ষিক মঙ্গলদান বলিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিব এবং তাহাতে ঈশ্বর আপনারও কল্যাণ করিবেন।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে লিখিত

দ্র. সজনীকান্ত দাস, 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' (১৩৯৫), পৃ. ৯৩

৪.

ওঁ

১০ অগস্ট ১৯০৩

বন্ধু

আপনি বুঝি আমার পাঠিকাকেও খাটিয়ে নিচ্চেন ? তিনি যে দুটি নাম দিয়েছেন সে ঠিকই হয়েছে কিন্তু তাঁর নালিশ সম্বন্ধে আমার তরফে

দুটি একটি কথা বল্‌বার আছে। আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে— তার একটি প্রধান কারণ এই— যে ব্যক্তি লিখেছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকী ছিল না। তার সেই খোকা-জন্মের অতি প্রাচীন ইতিহাসে থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে তাই তার লেখনীর সম্বল— খুকীর চিত্ত তার কাছে এত সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া আর একটি কথা আছে— খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ, সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী— তখন খুকী ছিল না— মাতৃ-শয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্ত্তী সম্রাট ছিল— সেই জন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্য্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত রঙে রঙিয়ে ওঠে— সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেল্‌চে— তাকে নিবারণ করতে পারিনে।·· ইতি ২৫ শ্রাবণ ১৩১০

মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত
'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৮, পৃ. ৪৬

৫. ওঁ

(অগ্রহায়ণ ১৩০৯ ? । নভেম্বর ১৯০২ ?)

বন্ধুবরেষু

ঈশ্বর আমার শোককে নিষ্ফল করিবেন না। তিনি আমার পরম ক্ষতিকেও সার্থক করিবেন তাহা আমার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছি। তিনি আমাকে আমার শিক্ষালয়ের এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিলেন।···

মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত
'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৮, পৃ. ৪২

৬. ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

…বহুদিন পূর্ব্বে একদিন নাটোরের মহারাজ পদ্মাতীরে আমার বোটে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা ছিল প্রতিদিন তাঁকে একটা কিছু সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ খাওয়াব। মীরার মা ছিলেন এই চক্রান্তের মধ্যে— তিনি খুব ভাল রাঁধতে পারতেন। কিন্তু নতুন খাদ্য উদ্ভাবনের ভার নিয়েছিলুম আমি। সেই সকল অপূর্ব্ব ভোজ্যের বিবরণসহ তালিকা আমার স্ত্রীর খাতায় ছিল। সেই খাতা আমার বড় মেয়ের হাতে পড়ে। এখন তারা দুজনেই অন্তর্হিত। আমার একটা মহৎ কীর্ত্তি বিলুপ্ত হ'ল। রূপকার রবীন্দ্রনাথের নাম টিকতেও পারে, সূপকার রবীন্দ্রনাথকে কেউ জানবে না।… ইতি ৫ নভেম্বর ১৯৩১

দাদা

হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯, পৃ. ১১২

৭. ওঁ

কল্যাণীয়াসু

…একদা পদ্মার চরে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র কিছুকাল আমার অতিথি ছিলেন— প্রতিদিন তাঁর জন্যে নূতন একটা করে ভোজ্য আমি উদ্ভাবন করেছি— সেটা প্রস্তুত করবার ভার ছিল যাঁর পরে তাঁরও কিছু কৃতিত্ব তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এসব তিনি লিখে রেখেছিলেন খাতায়, সেই খাতা দখল করেছিল আমার বড়ো মেয়ে— সেও নেই, খাতাও অদৃশ্য—

গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে ভোগ খাদ্য নিরবধি, তার উপায় রইল না, অথচ রইল কতকগুলো কবিতা। ইতি ২২ অক্টোবর ১৯৩৩

দাদা

হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯, পৃ. ২১১

৮. ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার সহিত আমার অনেকটা পরিচয় হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সেইজন্য সঙ্কোচ পরিহারপূর্বক আপনার কাছে একটি ভিক্ষা লইয়া উপস্থিত হইলাম। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কয়েকটি দরিদ্র বালককে বিনা বেতনে পড়াইয়া থাকি। তাহাদের ব্যয়ভার আমরা বান্ধবদের মধ্যে পরস্পর ভাগ করিয়া লইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। একটি বালকের ভার আপনি যদি গ্রহণ করেন তবে উপকৃত হইব। হিসাব করিয়া দেখা গেছে প্রত্যেক বালকের খাইখরচের জন্য মাসে প্রায় ১৫৲ টাকা অর্থাৎ বৎসরে ১৮০ টাকা লাগে। প্রতি বর্ষে অগ্রহায়ণ মাসে এই ১৮০ টাকা বার্ষিক দান পাইবার জন্য আমি সুহৃদগণের দ্বারে সমাগত। আপনাকে বলিতে সঙ্কোচ করিব না আমার পরলোকগত পত্নীর কল্যাণকামনার সঙ্গে আমি এই ভিক্ষাব্রত জড়িত করিয়াছি।

আর একটি কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি আমার বিদ্যালয়ের সঙ্গে আপনার যোগ আমি কামনা করি। আপনাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা ব্যতীত এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হইবে না। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত
'রবীন্দ্রভাবনা', এপ্রিল ১৯৮১, পৃ. ৬৫

পরিশিষ্ট ২

মৃণালিনী দেবী প্রসঙ্গে

অমলা দাশের পত্র : ইন্দিরা দেবীকে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী অমলা দাশ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী ছিলেন তাঁহার প্রিয়সখী। সংগীতপ্রিয় অমলা দাশ তাঁহার সুকণ্ঠের জন্য কবির বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে আগ্রহের সহিত নিজের গান শিখাইয়াছিলেন; এই রকম অনেকগুলি গান তিনি রেকর্ডে গাহিয়া রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম মহিলা শিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁহার 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা' (১৯৭২) গ্রন্থে ২১টি রেকর্ডের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

মৃণালিনী দেবীর সহিত অমলা দাশের সখীত্বের সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহার ভগিনী ঊর্মিলা দেবী তাঁহার 'কবিপ্রিয়া' স্মৃতিকথায়। রবীন্দ্রনাথের একটি গানেও তাহা বিধৃত আছে, পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সম্পাদিত রবীন্দ্রায়ণ, দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৬৮), সংকলিত ভাগিনেয়ী সাহানা দেবীর 'কবির সংস্পর্শে' হইতে তাহা প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উদ্‌ধৃত হইল :

'কবিপত্নীর সঙ্গেই ছিল মাসিমার সবচেয়ে বেশি ভাব। তাঁকে কাকীমা বলে ডাকতেন। এই দুই সখীর একত্র অন্তরঙ্গ ভাবে গল্পালাপাদির একটি চিত্র আছে রবীন্দ্রনাথের গানে, গানটি হচ্ছে—

ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছে করে তোদের মতো মনের কথা কই।
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি
কোণে বসে কানাকানি,
কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই।

এ গানটির কথা মাসিমার মুখেই শুনেছি, আর গানটিও তাঁকে অনেকবার গাইতে শুনেছি।'

১.

[* * মধুপুর। ২৩ নভ. ১৯০২]
শনিবার

ভাই বিবি,

আজ মামা এখানে এসেছিলেন তাঁর কাছে শুনলুম তুমি লিখেছ কাকীমার[১] অবস্থা খুব খারাপ। এতদূর থেকে খুঁটিনাটি ভাল খবরে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া বড় শক্ত। মনটা আজ এত খারাপ হয়েছে কি আর বলব। আমার চিঠি তোমার হাতে পোঁছবার আগে কি হয়েছে ভগবান জানেন। আমি কাছে থেকে ২ দিনও কিছু করতে পারলুম না এ দুঃখ রাখ্‌বার স্থান নাই। সংসারে আমার বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। কাকীমার মত বন্ধু আমার আর নাই, আর হবার সম্ভাবনাও নাই। কোন রকমে মনে কষ্ট হ'লে, কোন অশান্তি হ'লে দৌড়ে যাবার স্থান আর দ্বিতীয় নাই। তুমি জান না বিবি, বাপ মায়ের সঙ্গে রাগ করে কতবার কতদিন কাকীমার কাছে গিয়ে থেকেছি। এমন সম্পূর্ণ শান্তিতে ও নির্বিবাদে আর কারু সঙ্গে কখনও কাটাই নি। কাকীমার উপর যে আমার কতটা আব্দার ও জুলুম চলত কি আর বলব। হতে পারে আমি মিথ্যা অমঙ্গল চিন্তা করছি, ভগবান করুন তাই যেন হয়। দিন রাত বড় ব্যস্ত হ'য়ে থাকি। বেলা, রাণীর কাছে চিঠি লিখ্‌তে সাহস হয় না, তাই তোমার কাছে লিখ্‌ছি, যদি বিশেষ অসুবিধা না হয় ২ লাইন করে তুমি যদি লিখে দাও বড়ই উপকার হয়। আর বিশেষ কি লিখব আমরা সকলে এক রকম ভালই আছি। চিঠির উত্তর শিগগির দিয়ো। আজ তবে আসি। ইতি—

অমলা

১ মৃণালিনী দেবী

২.

[*মধুপুর। ২৬ নভ. ১৯০২]

মধুপুর।

বুধবার।

ভাই বিবি,

তোমার চিঠি কাল পেয়েছি। যদিও যথেষ্ট প্রস্তুত ছিলুম তবু প্রথম ৩ লাইন পড়ে থম্‌কে রইলুম। যে দিন শেষ দেখে এলুম সে দিনই আমার অন্তরাত্মা ডেকে বলেছি জ্ঞান আর ফিরবে না, তোমাদেরও সে কথা অনেকবার বলেছি। সকলেই দেখ্‌ত, আমিও দেখতুম আমার কেন খারাপ লাগত জানিনে। যাক্, যা আশঙ্কা করে বুক কেঁপে উঠ্‌ত সেটা হ'য়ে গেছে। কাল তোমার চিঠি পাবার পর থেকে কি ভাবে দিন রাত কাটাচ্ছি ভগবান জানেন। আমার এ বেদনা বুঝবার লোক কেউ নেই যদি স্বর্গগত আত্মার আমাদের সঙ্গে কোন সংশ্রব থাকে যদি বোঝবার ক্ষমতা থাকে তা হলে তিনি বুঝবেন। শমী আমার বড় আদরের— কাকীমা বলতেন, "শমীর উপর তোমার অনেক দাবী আছে— বড় হ'লে তাকে বুঝিয়ে দেব।"

ইচ্ছে করছে দৌড়ে বেলা শমীদের কাছে যাই। ওদের সঙ্গে এক সঙ্গে তাঁর অনেক স্নেহ ভালবাসা ভোগ করেছি, চোখের জলটাও ওদের সঙ্গে ফেলতে পারলে অনেক আরাম করত। বহুদিন তাঁর সঙ্গ ছেড়েছি, কত দুরে দুরে থেকেছি তবু মনে করতুম আমার একটা আশ্রয় আছে নির্ভর করবার লোক আছে। কথাটা বড় অস্বাভাবিক শোনায় আমি তাঁর কে ?— কিন্তু তবু কি আশ্রয় ছিল কেমন করে বুঝিয়ে বলব। এবারে বোলপুরে গিয়ে আমাকে লিখেছিলেন 'অমলা, আমার আশ্রম একবার দেখে যেয়ো।" আমি বলেছিলুম "দেখব বই কি, আপনার আশ্রমে আমার জন্য একটু স্থান রাখবেন কি ? যদি কোন দিন অন্য কোন খানে স্থান না পাই, আপনার কাছে যাব।" তিনি লিখেছিলেন, "তুমি কখন বিশ্বাস কর আমার কাছে

তোমার স্থান হবে না ?" চিরকাল ভাবতুম.বাপ মায়ের অভাবে যদি অন্য কোথাও আশ্রয় না পাই, আপনা ভাইও যদি স্থান না দেয় একমাত্র আশ্রয় আমার আছে যেখানে গেলে ফিরব না। এমনই নির্ভর। বিবি, আমার সে মহাআশ্রয় ভেঙ্গে গেছে। কোনও কারণে কোন অশান্তি মনে এলে, কোন কষ্ট পেলে, দৌড়ে কাকীমার কাছে যেতে ইচ্ছে করত, যে সময় তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি সে সব দিনের কথা মনে হ'ত। তাঁর কাছে যাওয়া দূরে থাক্— একখানা চিঠি লিখে কত সান্ত্বনা পেতুম। এখন আর কারু কাছে যাবার নেই। জোড়াসাঁকোর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচল। আমার গাড়ির শব্দ শুনে কে আর সিঁড়ির কাছে হাসিমুখ নিয়ে দাঁড়াবেন। তিনি এসেছেন খবর পেয়ে সেই দিনই না গেলে কি অভিমানই করতেন, আমি যে এবার তাকে কি অবস্থায় ফেলে এলুম জানতে পারলে কত অভিমান করতেন। মাঘ মাস আসছে, ১১ই মাঘের সব আমোদ-আহ্লাদ শেষ হয়ে গেছে। সেবার কাকীমাকে ১১ই মাঘে আনেন নি বলে রবিকাকার উপর ভয়ানক [রাগ] করেছিলুম বল্লুম এমন জানলে আমি গান করতে[1] রাজি হতুম না। বিবি, এবার রাগ করেও ১১ই মাঘে আনতে পারব না। মনে যা আসছে পাগলের মত বকে যাচ্ছি। কিন্তু যখন ভাবি আমার কি তুচ্ছ কষ্ট— দশ দিনে নয় দশ বছরে ভুলে যাব— বেলা শমী ওদের যে অভাব হ'ল তা কি কোন দিন ঘুচবে ? ওদের কথা ভাবলে নিজের কষ্ট অতি সামান্য মনে হয়। রবিকাকার কথা ভাবতেই পারি নে ; কি সুখের সংসার যে ভেঙ্গেছে। অনেকে ভাবত রবিকাকার বড় দুর্ভাগ্য এমন অযোগ্য স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে হয়। তিনি যে কি ছিলেন খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে না মিশলে কারু জানবার সম্ভাবনা ছিল না। রবিকাকা কি রকম স্ত্রী পেয়েছিলেন, এতদিন তো অনেক বুঝেছেন এখন আরও পদে পদে বুঝবেন। যাদের কোন কায নেই জীবনের কোন উদ্দেশ্য

১ দ্র. পত্রসংখ্যা ২৫, পৃ. ৪৪

নেই যাদের মৃত্যুতে কারু কোন ক্ষতি নেই এরকম লোক যেখানে সেখানে পড়ে আছে। আমাদের মত অসার অপদার্থ, কর্ম্মহীন জীবন নিয়ে পড়ে আছি আর সংসারের সার রত্ন চলে গেলেন। এ অবিচার কেন কে বলবে? একটা সংসার ছারখার করে কয়েকটি শিশুকে অসহায় মাতৃহীন করে কি মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল জানি নে, তবু ভাবতে গেলে বলি "তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" হয়ত বা এ সংসারে থাকৃতে গেলে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হ'ত— তিনি সতীলক্ষ্মী ছিলেন সব দুঃখ কষ্টের হাত এড়িয়ে সব সুখ সম্পদের মধ্যে থেকেই যেখানে দুঃখ নেই শোক নেই সেই অমৃত লোকে গেছেন। তাঁর মত লোকেরই উপযুক্ত স্থান সন্দেহ নেই। আজ যে গভীর বেদনা অনুভব করছি ক্রমে সেটা কমে আসবে, সব বুঝেও থেকে থেকে মন হু হু শব্দে কেঁদে ওঠে। এখানে এক দণ্ডও থাকৃতে ইচ্ছে করছে না। নানা কাযকর্ম্মে ডুবে আছি। সবই করছি কিন্তু হাতে বশ নেই পায়ে জোর নেই মনে হচ্ছে এক দিকটা শূন্য হয়ে গেছে। রবিকাকা, মীরা শমী ওদের বিষণ্ণ চেহারা আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাল রাত্তিরে স্বপ্নে দেখেছি রবিকাকা বলছেন "অমলা তুমি মীরা শমীর কাছে আসবে না?" রবিকাকার সে উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টি কিছুতেই ভুলতে পারছি নে।

যিনি অভাব ঘটান তিনিই শান্তি আনেন, এখন একমাত্র ভরসা ভগবানের করুণা। যে অসহায় শিশুদের আশ্রয় গেছে, প্রার্থনা করি ভগবানের অজস্র করুণা তাদের উপর বর্ষিত হউক। মাতৃহীনদের মাতা হ'য়ে তিনি সর্ব্বদা নিরাপদে রাখুন। তোমার, আমার কোন সাধ্য নাই। রবিকাকা এখন কোথায় কি ভাবে আছেন লিখো। বেলা রথী ওদের সকলের খবর দিয়ো। বিবি, তোমাদের চিঠি পেলে অনেকটা ভাল লাগবে, কেউ আমার কষ্ট বোঝবার নেই বলে আরও বেশী কষ্ট হচ্ছে। বেলার কাছে চিঠি লিখতে সাহস হচ্ছে না। কত কথা একটু একটু করে সারাদিন মনে হচ্ছে, কি আর বলব, দূরে আছি বলে আরও বেশী ছট্‌ফট্‌ করছি।

যাক্, যার উপায় নেই ভেবে আর কি করব। তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করে রইলুম আজ তবে আসি।

ইতি—

অমলা

৩. ওঁ [*মধুপুর। ৪ ডিসে. ১৯০২]

বৃহস্পতিবার

ভাই বিবি,

তোমার চিঠিখানা পেয়েছি। ছেলেদের খবর পাবার জন্য মনটা খুবই ব্যাকুল ছিল। রবিকাকার চিঠি একখানা পেয়েছি। খুব সংক্ষেপে ঘটনাটা। আমাকে জানিয়েছেন ও লিখেছেন ছেলেদের মুখের দিকে চেয়ে অনেক বার আমাকে মনে করেছিলেন। ছেলেদের কথা বিশেষ কিছুই লেখেন নি। আমাকে মনে করে যে চিঠি লিখেছেন সেইটেই যথেষ্ট মনে করি। চিঠিখানা পড়ে তাঁর মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারলুম। যে আংটীর কথা লিখেছ সেটা বেশ মনে আছে। শমী হবার এক বৎসর আগে শিলাইদহ ওঁদের সঙ্গে যেবার ছিলুম একদিন রাত্তিরে বোটের জানলার ধারে বসে আমার হাত থেকে খুলে কাকীমাকে পরিয়ে দিয়েছিলুম। ওই আংটীর সঙ্গে আমার অনেক কথা গাঁথা আছে। যখনি অনেকদিন পরে দেখা হ'ত আমাকে আংটী দেখিয়ে বলতেন "এই দেখ তোমার আংটী একদিনও হাত থেকে খুলিনি" শেষ পর্যন্ত হাতে আংটী ছিল। কাকীমার সঙ্গে যে কি সম্বন্ধ ছিল কোন দিন ভাল করে বুঝতে পারি নি। এক হিসাবে বন্ধু ছিলেন— তেমন বন্ধু আর কখন হয় নি হবেও না, অন্যদিকে মায়ের মত ভক্তি করতুম। বয়সে ছোট ছিলেন বটে কিন্তু একদিনের জন্য তা মনে হয় নি। তাঁকে যে ভালবাসতুম, তিনি বেঁচে থাকতে কোন দিন বুঝতে পারি নি — এখন সেটা

শতগুণে বেড়ে উঠেছে প্রতিদিন তিল তিল করে তাঁর স্নেহ যত্ন যা কিছু পেয়েছি সব এক সঙ্গে বুকের উপর চেপে ধরছে। খেতে হয় খাচ্ছি— কতকগুলি কর্তব্য আছে করছি। যত বেশী কাযকর্ম্মে ব্যস্ত থাকি তত ভাল মনে করে— সারাদিন কোন না কোন একটা কায নিয়ে আছি অবসরের সময়টা বড়ই পীড়ন করে। এমন lonely লাগে কি আর বলব। ছেলেদের দেখবার জন্য মনটা খুবই ছট্‌ফট্‌ করে। এখান থেকে ফিরে যেতে যেতে তারা কলকাতায় থাক্‌বে কি না, থাক্‌লেই বা যোড়াসাঁকো কি করে যাব। দুদিন দেরী হ'লে খবর পাঠিয়ে ডেকে নেবার লোক আর নেই। রাণীর জন্য আমার ভারি ভাবনা হয়েছে। একে তো ওর শরীর অত্যন্ত খারাপ তার পরে এই শোকটা সব চেয়ে ওরই বেশী লাগবে। ও মেয়ে, ভারি সহজে কাতর হ'য়ে পড়ে। একবার একটা পাখী পুষেছিল সে পাখীটা মারা গেলে যে কাতর হয়েছিল। কাউকে কিছু বলত না গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে অস্থির হ'ত ওর স্বভাব ভারি চাপা। বেলার ঘর সংসার হয়েছে, স্বামী ও তার আত্মীয়দের জন্য একটা টান হ'য়েছে, শাশুড়ি আছে মায়ের অভাব কিছু পূরণ করবে। মীরা ও শমী ছোট অভাব অনুভব করবার ক্ষমতা তাদের এখনও ভাল করে হয়নি। রথী হাজার হলেও ছেলে— লেখাপড়া নিয়ে নানা কথায় নানা কাজে ভুলে থাকবার অবসর আছে। আমার বোধ হয় রাণীর সব চেয়ে কষ্ট হবে। বালিগঞ্জে থাকাতে আদৎ ঘটনাটা ভাল করে বুঝতে পারছে না। যোড়াসাঁকো গেলে ওর বেশী কষ্ট হবে। রবিকাকা একবার বলেছিলেন, আমরা বোলপুর যদি যেতুম তা হ'লে মীরাকে ও শমীকে আমার সঙ্গে দিতেন। আমি অবিশ্যি কিছু বলতে পারি নে আমার নিজের বাড়ি হ'লে রাণীকে জোর করে নিয়ে আস্‌তুম। এখানে যে রকম খোলা মাঠের হাওয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস এ রকম কোন যায়গায় এলে খুব অল্প সময়ে ওর শরীর শুধরে যায়। কথাটা অসঙ্গত মনে হ'লে তুমি কিছু বোলো না। একবার মীরাকে দেবার কথা বলেছিলেন বলেই সাহস করে তোমার

কাছে লিখলুম। বেলাদের বড় বোন থাকলে তার যে কর্তব্য হ'ত আমি সেই কর্তব্যগুলি আমার মনে করি। কিন্তু মনে করলে কি হবে, আমি স্বাধীন নই ক্ষমতা কিছুই নেই, যদি সামান্য কাজেও আসি সেটা খুবই সুখের মনে করব। কাকীমার কাছে অনেক কারণে ঋণী ছিলুম সে সব ঋণ ইহজীবনে শোধ করতে পারব না। বিবি, তোমাকে কি লিখব বল, সারা দিন যত কথা মনে হয় সব লিখ্‌তে গেলে পাগল মনে করবে। কাকীমার সবরকম চেহারা মনে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে— শেষ যে চেহারা দেখে এসেছি মনে হচ্ছে ফিরে গিয়ে ঠিক তেমনি দেখব, সেই জন্যই যেন মনটা ফিরে যাবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে। তার পরে রবিকাকার একটা বিষণ্ন মুখের সঙ্গে সঙ্গে যা মনে পড়ে সেটা অসহ্য। আর কখনও দেখতে পাব না এটা কিছুতেই সহ্য হয় না। এতদিন তো আর একসঙ্গে থাকতুম না? রোজ একখানা করে চিঠিও লিখতুম না, তবু একটা ভরসা থাকত কোন দিন আসবেন কলকাতায় দেখা হবে। যাক্ ওসব কথা ভেবে কোন ফল নেই, তবু মন মানে না তাই থেকে থেকে বলি। সকলেরই জন্ম হ'লেই মৃত্যু আছে; আপশোষ এই যাদের গেলে কোন হানি নেই তারাই পড়ে থাকে। এবারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছে মৃত্যুই আমাদের শেষ নয় আরও উচ্চতর স্থান আছে, সে স্থানের উপযুক্ত না হ'লে লোক এ সংসার থেকে বিদায় নিতে পারে না। সেই জন্যে বেছে বেছে লোক যায়। তা নইলে কাকীমার জীবনের শেষ হবার সময় তো হয়নি? এত শীগ্‌গির তাঁর শেষ হবার কি কারণ? আমার মনে হয় এ সংসারের সম্পূর্ণতা পেলে সেই অদৃশ্য লোকের উপযুক্ত হয়— সেই সম্পূর্ণতা তিনি খুব অল্প সময়ে পেয়েছেন— নূতন জীবন নিয়ে উচ্চতর লোকে চলে গেছেন। আমাদের সঙ্গে কোন সংস্রব আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার সর্বদাই মনে হয় যাঁরা আগে গেছেন তাঁরা আমাকে এবং আমার সব কায সর্বদাই দেখছেন, আমাদের দেখবার কোন উপায় নেই। আমার মৃত্যুর পরে তাঁদের দেখা পাব কিনা জানি না কারণ

কে জানে কোথায় কি পাপ করেছি, তাঁদের কাছে যাবার উপযুক্ত হ'তে পারব কিনা। তোমাকে হয়ত অনেক কথা বলে বিরক্ত করছি। কাছে থাক্‌লে কথায় যে আলোচনা হ'তে পারত, চিঠিতে সেইটে চালাচ্ছি। কি বক্‌ছি নিজেও জানিনে। আজকাল মাথায় এত কথা এক সঙ্গে আসে মাঝে মাঝে মাথাটা ভয়ানক শ্রান্ত মনে হয়। কাকীমার জন্য কিন্তু দুঃখ করতে ইচ্ছা হয় না। কারণ তিনি যেখানেই থাকুন সম্পূর্ণ শান্তিতে আছেন এই বিশ্বাস, কষ্ট শুধু যারা আছেন তাঁদের জন্য, রবিকাকার এমন সুখের এমন শান্তির ঘর ভেঙ্গেছে এই দুঃখ, এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই। তুমি লিখ্‌তে বলেছ তাই যা মনে আসছে তাই লিখ্‌ছি তা নইলে দ্বিতীয় লোক নাই যাকে ধরে দুটো কথা বলি। কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। আজ তবে আসি। রাণী কি রকম থাকে লিখো। মহারাণী খোকা খুকী ভালই আছে। আশা করি তোমরা ভাল আছ।

ইতি—

অমলা

প্রিয় বন্ধু —

আগামী রবিবার ২৪শে
অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভ-
লগ্নে আমার পরমস্নেহী শ্রীমান
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক।
আপনি অনুগ্রহপূর্বক বৈকালে উক্ত দিবসে
৬ নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি
সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং
আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন।
ইতি।

অনুগত
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমন্ত্রণলিপি

পরিশিষ্ট ৩

মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে
অন্যান্যদের স্মৃতি এবং পত্র

মৃণালিনী দেবী তাঁহার স্বল্পায়ু জীবনে, সেবাপরতা ও সহৃদয় ব্যবহারের গুণে, আত্মীয়-বান্ধবগণের চিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন। অন্তরালবাসিনী সংসারকর্মে নিবিষ্টা এই নারী স্নেহমমতায় ও সেবায় কবিহৃদয়কেও একান্তভাবে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; পত্নী-বিয়োগের পরে লিখিত 'স্মরণ' কাব্যের কবিতাগুলিতে এবং 'উৎসর্গ' প্রভৃতি গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায় সেই শোকগাথা গভীর চিত্তবেদনার অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। মৃণালিনী দেবীর স্নেহসিক্ত হৃদয়ের পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ তাঁহার সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ হইতে সেগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ বর্তমান পরিশিষ্টে সংকলিত হইল।

১. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শর্বরী গিয়াছে চলি। দ্বিজ-রাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতিক্ষিছে রবির উদয়।
গন্ধহীন দু-চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
সঁপিছে রবির শিরে এই আজ আশিসিয়া তারে
'অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক
স্ববর্ণ তুলির তব পুরস্কার! মত্রজার কারে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক।'

'যৌতুক কি কৌতুক'-এর শেষাংশ।
'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১২৯০, পৃ ৬৪

২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খুলনা জিলার দক্ষিণডিহি গ্রামের শুকদেবের বংশধর বেণীমাধব রায়চৌধুরীর প্রথম সন্তান ভবতারিণী (মৃণালিনী)। তাঁহার জন্মবর্ষ ১২৮০ সাল।··· খেলাঘরে ঘরকন্নার সময় মৃণালিনীর স্বভাবের একটি বিশেষত্ব সকলেই লক্ষ করিতেন, ইহা সঙ্গিনীদের উপর তাঁহার কর্তৃত্বের সখীসুলভ অধিকার, ইহাতে কর্তৃত্বের সহজাত তাপ-চাপ ছিল না, সখীসুলভ প্রণয়প্রবণতায় ইহা সুস্নিগ্ধ কোমল সহনীয়; সঙ্গিনীরা তাই সখীর নির্দেশ মানিত, খেলা ও চলিত সখীভাবে অবিরোধে।···

দক্ষিণডিহি গ্রামে এমন-কি গ্রামের চতুর্দিকে ক্রোশের মধ্যেও উচ্চ-শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল না। গ্রামে একটি প্রাইমারি পাঠশালা ছিল, এই

পাঠশালায় মৃণালিনীর বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়। প্রথম বর্গ পর্যন্ত অবাধে পড়াশুনা চলিয়াছিল। কিন্তু সমাজে নিন্দার ভয়ে সুদূর পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই; কাজেই বাংলা লেখাপড়ার সাধ ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এইখানেই মিটাইতে হইয়াছিল।...

১২৯০ সালে চব্বিশে অগ্রহায়ণ রবিবারে রবীন্দ্রনাথের সহিত মৃণালিনী দেবীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ চতুর্বিংশতিবর্ষীয় যুবক, মৃণালিনী দেবীর বয়স একাদশ বর্ষ। বিবাহে ঘটকালি করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের মাতুল ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসিমা আদ্যাসুন্দরী। প্রচলিত প্রথানুসারে কন্যার পিতা তাঁহার বাড়িতে বর লইয়া বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিলে মহর্ষি তাহাকে জানাইয়াছিলেন, কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইবে। এই প্রস্তাব স্বীকৃত হইলে মহর্ষি দক্ষিণডিহির বাড়িতে নানাবিধ খেলনা বসনভূষণাদি কর্মচারী সদানন্দ মজুমদারের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। সদানন্দ মহর্ষির কথানুসারে গ্রামে নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইয়া কন্যার ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা বোধ হয় 'কন্যার আশীর্বাদ' বা 'পাকা দেখা'র সামাজিক বিধি। বিবাহে মহর্ষির যে বংশ-গোত্রের বিবেচনা ছিল, এ বিবাহে তাহার ব্যভিচার হয় নাই। সমৃদ্ধি ও বিদ্যাবত্তায় রায়চৌধুরীবংশ ঠাকুরপরিবারের সমতুল না হইলেও এই বৈবাহিক সম্বন্ধে মহর্ষিদেবের মতদ্বৈধ ছিল না। জোড়াসাঁকোর বাড়ির ব্রহ্মোৎসব-দালানে কুলপ্রথানুসারে পরিণয়োৎসব শুভসম্পন্ন হয়। নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত মহর্ষি সমাজেতে কনিষ্ঠ পুত্রের শেষ সামাজিক কার্য নিষ্পন্ন করেন।

পিতৃগৃহে কন্যার নাম ছিল 'ভবতারিণী', রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে সংগতি রক্ষা না হওয়ায় বিবাহের পরে পরিবর্তিত নাম হইল 'মৃণালিনী'। রবি-মৃণালিনীর প্রণয়-সম্বন্ধ কবিকল্পিত, চিরপ্রসিদ্ধ; তাই মনে হয়, এই

নাম কবিকৃত কবিকল্পনাজাত। মতান্তরে, কবির প্রিয় 'নলিনী' নামের ইহা প্রতিশব্দ। যাহাই হউক, 'ভবতারিণী' বধূজীবনে 'মৃণালিনী' নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। 'বৈষ্ণব কবিতা'য় কবি যে 'ধরার সঙ্গিনী'র চিত্র বর্ণনার নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার কল্পনামাত্র নহে, ইহা বাস্তবিকের অনুভূতি অনুস্যূত পরিণাম; কবির সেই চিত্রগত বর্ণ কবিপত্নীর সাংসারিক জীবনে নানাবিষয়িনী শক্তিতে মূর্ত ও সার্থক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছে।

পিতৃগৃহে মৃণালিনী দেবীর বিদ্যাশিক্ষার যে ক্ষুদ্রতম পরিধি তাহা ঠাকুরপরিবারের বধূগণের ও কন্যাদিগের বিদ্যার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। প্রতিভাবান সুশিক্ষিত কবির অনুরূপ স্ত্রীরত্ন লাভ বিরল হইলেও একান্ত বিরল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সৌভাগ্যমূলক ভবিতব্যতা সর্বত্র অবাধ; তাই মহর্ষির এই পরিণয়ে অসম্মতির কোনো কারণ ছিল না; কবিও পিতৃদেবের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু সহধর্মিণীকে অন্বর্থ সহধর্মিণী করিবার নিমিত্ত কবি নববধূর ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, এমন-কি বালিকা বধূকে লরেটো হাউসে পড়িবার অনুমতি দিলেন।

এই সময়ে নগেন্দ্রনাথ দিদির কাছে আসিয়া একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়িতেন। অবসরক্রমে দিদি পড়া বলিয়া দিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেন। কখনো কখনো নগেন্দ্রনাথ দুই-একটি ইংরেজি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেন; দিদি অর্থ বলিয়া দিয়া পাঠ বুঝাইয়া দিতেন।

পত্নীর ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই কবি নিরস্ত হইতে পারেন নাই। রামায়ণাদির সংস্কৃত সহজ শ্লোকের অর্থগ্রহণ যাহাতে অনায়াসে হয় তিনি সেই উদ্দেশ্যেই পত্নীকে মোটামুটিভাবে কিছু সংস্কৃত শিখাইবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সংস্কৃত-শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। কবির নির্দেশানুসারে বিদ্যারত্ন রামায়ণের গল্পাংশের শ্লোকের বাংলায় ব্যাখ্যা করিতেন, ছাত্রী সেই ব্যাখ্যা

শুনিয়া তাহার বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিতেন। এইরূপে রামায়ণের গল্পাংশের অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছিল।

বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির শ্লোক গদ্যাংশ কখনো কখনো ব্যাখ্যা ও সরল বাংলায় অনুবাদ করিয়া কাকিমাকে বুঝাইয়া দিতেন। এই প্রকারে অনুবাদের সাহায্যে ও বলেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায়, শ্লোকের আবৃত্তি শ্রবণে মৃণালিনী দেবীর সংস্কৃত-অর্থবোধে বেশ-কিছু পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।

রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভবনে মায়ের স্বহস্তে পেন্সিলে লিখিত একখানি খাতা দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, খাতাখানি মায়ের লিখিত রামায়ণের সেই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি। খাতা খুলিয়া দেখিলাম ইহা রামায়ণের অনুবাদ-পাণ্ডুলিপি নহে, মহাভারত মনুসংহিতা ঈশোপনিষৎ কঠোপনিষৎ প্রভৃতির অনুবাদ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।...

কবি এখন সম্পূর্ণ গৃহস্থ না হইলেও গৃহী হইয়াছেন বলা যায়। বিবাহের পর তিনি পৈতৃক প্রাসাদে নির্ধারিত প্রকোষ্ঠে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন; তখন ঠাকুরপরিবার সুবিপুল— মহর্ষির পুত্র পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী কন্যা দৌহিত্র দৌহিত্রী আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতির স্থান সুবিশাল ত্রিতল অট্টালিকায়ও যথেষ্ট হইত না।

কাব্যময় জীবন উপভোগ করায় কবির পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। একবার তিনি ইচ্ছা করিলেন, গাজিপুরে কোনো নিভৃত নিবাসে বাস করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভোগে কবিজীবন সফল করিবেন। এই অভিপ্রায়ে ১২৯৪ সালের শেষভাগে তিনি গাজিপুরে যাওয়া স্থির করিলেন। এই সিদ্ধান্তের অজুহাতে তিনি লিখিয়াছেন— "বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল।... শুনেছিলুম, গাজিপুরে আছে গোলাপের ক্ষেত।... তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল।"

এখন রবীন্দ্রনাথের পরিবার ক্ষুদ্র— পত্নী মৃণালিনী দেবী, শিশুকন্যা বেলা। এই সংসার লইয়া কবি গাজিপুরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাঁহার দূর-সম্পর্কিত আত্মীয় আফিম-বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী গগনচন্দ্র রায় বাস করিতেন। তাঁহার সাহায্যে কবির সুখস্বচ্ছন্দে বাসোপযোগী ব্যবস্থা সমস্তই সহজেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

সপরিবারে গাজিপুরে বাস সাংসারিক কবিজীবনের প্রথম ও প্রধান পর্ব। আপনার সংসারে স্বামীকে আপনার মতো করিয়া পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্ত্রীমাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। বৃহৎ ঠাকুরপরিবারের মধ্যে বাসে কবিপত্নীর সে অভিলাষ এ পর্যন্ত অপূর্ণই ছিল। গাজিপুর-বাসে পৃথক্ সাংসারিক জীবনের সূত্রপাতে তাহা এই প্রথম কার্যে পরিণত হইল; পক্ষান্তরে যৌবনের পরিপূর্ণতায় কবিও এখন প্রথম পাইলেন পত্নীকে ধরার সঙ্গিনীরূপে— প্রণয়িনীরূপে 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে, গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা।'···

মৃণালিনী দেবী যখন শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে বাস করিতেন, সেই সময়ে মুলা সিং নামে একজন পাঞ্জাবী তাঁহার নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ দুরবস্থা নিবেদন করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিল— "মাইজী, একটি চাকরি দিয়া আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমি সপরিবারে মারা পড়িব।" দরিদ্রের করুণ প্রার্থনায় মাইজীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে ছিলেন না, পক্ষান্তরে অপেক্ষা করাও তখন সম্ভব হইল না। কুঠিবাড়ির দরোয়ানের কার্যে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে তিনি মুলা সিংকে নিযুক্ত করিলেন। দরিদ্রের দুঃখের কিঞ্চিৎ অবসান হইল।

মুলা সিং-এর দেহ যেমন দীর্ঘ, তেমনই পরিপুষ্ট সুগঠিত। দেহের অনুপাতে দুবেলায় চার সের আটা সে খাইতে পারিত। একমাস চাকরির পরে সে দেখিল, তাহার স্বল্প বেতন ভূরিভোজনে নিঃশেষ হইয়াছে। বাড়িতে

কিছুই পাঠাইতে পারিল না, বড়োই বিষণ্ণ হইল। ক্রমে ক্রমে ইহা মৃণালিনী দেবীর কর্ণগোচর হইলে তিনি মুলা সিংকে ডাকিয়া বিষাদের কারণ শুনিতে চাহিলেন, সেও অকপটে সমস্ত কথা তাঁহাকে জানাইল; ব্যথিত হইয়া মাইজী সেইদিন অবধি প্রত্যহ সংসারের ভাণ্ডার হইতে চার সের আটা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বেতন বৃদ্ধি হইল, কিন্তু আটার ব্যবস্থা পূর্ববৎই রহিল।

এই সময় মৃণালিনী দেবী কুঠিবাড়িতে একটি শাক-সবজির বাগান করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ছিল। অবসরমত সময়ে সময়ে মেয়েদের সঙ্গে লইয়া বাগানের কাজকর্মও তিনি করিতেন। যে-সকল এস্টেটের কর্মচারী সপরিবারে বাস করিতেন তাঁহাদের বাসায় এই বাগানের শাক-সবজি তরকারি তিনি পাঠাইয়া দিতেন। অল্পবেতনভোগী আমলা-দিগের জন্য সরকারি ব্যয়ে একটি মেস করিয়া সরকারি তহবিল হইতে ঠাকুর চাকরের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই মেসেও বাগানের শাক-সবজি তরকারি সপ্তাহে দুইবার পাঠাইতেন।

মৃণালিনী দেবী যেদিন শিলাইদহ হইতে চলিয়া আসেন সেদিন ঠাকুর চাকর ও আমলাদের বিষাদের সীমা ছিল না, বিশেষত মাইজীর বিদায়ে মুলা সিং-এর কী কান্না! সে যে মাইজীর করুণায় অপার দুঃখের পার পাইয়াছিল! এ যে তাহার পক্ষে বিজয়াদশমীর দিন। বিষাদমলিন সকলকে কাছে আনিয়া মাইজী স্নিগ্ধ সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন—"শান্ত হও, আমি আবার আসব, তোমাদের কি কখনো ভুলতে পারি!" সস্নেহ প্রবোধবাক্যে সকলে কিছু আশ্বস্ত হইল। স্নেহের ইহাই মোহিনী শক্তি!

মহর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী মহর্ষির পুত্রবধূগণের কাকিমা। তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকিতেন না, বির্জিতলায় একটি বাড়িতে যাবজ্জীবন বাস করিয়াছিলেন। মহর্ষিদেব এই বাড়ি তাঁহাকে দিয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ

করিতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিতেন, বউমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-সালাপ আমোদ-সামোদ করিয়া চলিয়া যাইতেন, বউমাদের সনির্বন্ধ চেষ্টায়ও কখনও জলগ্রহণ পর্যন্ত করিতেন না। পরম আত্মীয়গণের সহিত ঈদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার আপাতত বিশেষ বিস্ময়জনক। কিন্তু কার্যমাত্রের কারণ থাকে, ইহারও গূঢ় কারণ ছিল। মহর্ষিদেব ভ্রাতৃবধূর মাসহারা এক হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কোনো উপায়ে বধূমাতার প্রাণনাশ করিতে পারিলে মাসহারা দিতে হইবে না, এই অমূলক সন্দেহ ত্রিপুরাসুন্দরীর মনে দৃঢ়মূল হইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে মহর্ষির চরিত্রে এইরূপ অভাবনীয় সন্দিগ্ধ মনোবৃত্তি স্ত্রী-স্বভাবসুলভ পাত্রাপাত্রের বিচারশক্তির অভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। যাহা হউক কাকিমার তাদৃশ আচরণের মূলে এই সন্দেহ সুদৃঢ়ই ছিল। মহর্ষির সদর খাজাঞ্চি প্রতিমাসে মাসহারা দিতে যাইতেন; তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, কাকিমা হাজার টাকার একখানি নোটই পছন্দ করিতেন, তাহাও বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লইতেন।

একবার কাকিমা জোড়াসাঁকোয় আসিলে মৃণালিনী দেবী না-ছোড় হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন; বলিলেন, "কাকিমা, আপনি বারবার আসেন যান, একবারও কিছুই খান না; আমি নিজেই মিষ্টান্ন তৈরি করেছি, তা আজ খেতেই হবে।" বউমার এই অভাবনীয় সনির্বন্ধ আবদারে কাকিমা বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, নানা উপায়ে বউমাকে নিরস্ত করার চেষ্টাও করিলেন; কিন্তু বউমার আবদার এড়াইতে পারিলেন না। কাকিমার নিমরাজ ভাব বুঝিয়া সুচতুর বউমা কালবিলম্ব করিলেন না, তখনই বড়ো পাত্রে ভরা নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিয়া কাকিমার হাতে দিলেন; বউমার এইরূপ ক্ষিপ্র আয়োজনে কাকিমার আর 'না-না' বলিবার উপায় রহিল না। অনন্যোপায় হইয়া পাত্র লইয়া উপবিষ্ট বধূদিগকে মিষ্টান্ন কিছু কিছু পরিবেশন করিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিলেন। মিষ্টান্নে যদি কিছু প্রাণনাশক মিশ্রিত

থাকে সকলেরই তাহা অনিষ্টকর হইবে— পরিবেশনে কাকিমার এই সন্দেহ-মূলক অভিপ্রায় গূঢ় ছিল, তৎক্ষণাৎ বউমারা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সংকল্পভঞ্জন হইল, সন্দেহভঞ্জন হয় নাই। সন্দেহ দুরতিক্রম্য।

বলেন্দ্রনাথের বিবাহে জননী প্রফুল্লময়ী দেবী ছোট জায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন— "বলুর বিবাহে খুব ঘটা হইয়াছিল।··· আমার ছোট জা মৃণালিনী দেবীও সঙ্গে যোগ দিয়া নানারকম ভাবে সাহায্য করেন। তিনি আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে ভালবাসিতেন। মনটা খুব সরল ছিল, সেইজন্য বাড়ির সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসিতেন।"

পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার্থ গৃহবিদ্যালয়ের পত্তন করিয়া কবি যখন শিলাই-দহের কুঠিবাড়িতে সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া মৃণালিনী দেবী কর্মচারীদিগের জন্য জমিদারি কাছারিতে পাঠাইয়া দিতেন। কখনো কোনো কোনো বিশিষ্ট কর্মচারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া কুঠিবাড়িতে খাওয়াইতেন। স্বভাব অব্যভিচারী।

বন্ধুবান্ধব লইয়া খাওয়াদাওয়ার আমোদ কবির স্বভাবে ছিল বড় কম না। একদিন প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে কবি মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক তিনি যে কেবল পত্নীকে এ কথা বলিতে ভুলিয়াছিলেন তাহা নয়, মধ্যাহ্নভোজনকালে তাঁহারও এ কথা স্মরণ হয় নাই। যথাকালে পরিবারবর্গের সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হইল। ভোজনান্তে কবি নিজকক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে বন্ধুর নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ নিমন্ত্রিত প্রিয়নাথ কবির বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখিবামাত্র আপনার বিষম ভ্রমের কথা কবির মনে হইল। বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া পত্নীকে নিমন্ত্রিত বন্ধুর উপস্থিতি জানাইলেন। স্থিরবুদ্ধি কবিপত্নী বন্ধুর সহিত কথাপ্রসঙ্গে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। রন্ধনকুশল ক্ষিপ্র হস্তে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন এবং ভোজনপাত্রে সাজাইয়া বন্ধুকে ভোজনগৃহে আনিবার জন্য কবিকে সংবাদ দিলেন। বন্ধুর

সহিত ভোজনগৃহে আসিয়া কবি দেখিলেন, পাত্র পূর্ণ, ভোজ্যের কোনো অংশেই ত্রুটি হয় নাই, সবই প্রস্তুত। দেখিয়াই কবি মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া গৃহিণীপনার সার্থকতা বুঝিতে পারিলেন। বন্ধু ভোজন করিলেন। নিপুণ গৃহিণীর বুদ্ধিমত্তায় গৃহীর নিমন্ত্রণ-বিভ্রাট ধরা পড়িল না, গৃহিণীর ইহাই দক্ষতা। কবি বলিয়াছেন— 'সা ভার্যা যা গৃহে দক্ষা।'

বন্ধুসংখ্যা অল্প হইলেও কবির গৃহে বন্ধুসমাগম অল্প হইত না। এইরূপ ভ্রান্তিমূলক নিমন্ত্রণ-বিভ্রাট কবির এই একবারই মাত্র নহে; কবির ভাব বুঝিয়াই মৃণালিনী দেবী নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, বন্ধুসমাগমে আর খাদ্য-বিভ্রাট ঘটিত না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কবির প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি প্রায়ই আসিতেন, সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে 'কাকিমা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে' এই আবদার করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিতেন। কাকিমা অপ্রস্তুত থাকিতেন না, সস্নেহ বাক্যে পাত্র-ভরা খাদ্যে চিত্তরঞ্জনের চিত্তরঞ্জন করিতেন। এই স্নেহের দৃশ্য বড়োই মধুর!

কবি ও লোকেন্দ্রনাথ একই সময়ে বিলাতে মর্লি সাহেবের ছাত্র ছিলেন, সহপাঠিত্বে তাই উভয়ের সৌহৃদ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির সঙ্গে দেখা করিতে লোকেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসিতেন, সুহৃৎ-পত্নী যথোচিত সমাদরে আতিথ্য করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন।

উদার স্বভাব পক্ষপাতহীন। বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথ কাকিমার কাছে থাকিতেই ভালোবাসিতেন; তাঁহাদের প্রতি কাকিমারও পুত্রবৎ স্নেহ ছিল। অকৃত্রিম স্নেহ এমনই মনোমোহন।

সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ে মৃণালিনী দেবীর নৈপুণ্য ছিল স্বাভাবিক। পূজার সময়ে (?) সত্যেন্দ্রনাথের পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটক একবার অভিনীত হইয়াছিল। নাটকের নারায়ণীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন মৃণালিনী দেবী। পূর্বে তিনি কখনো অভিনয় করেন নাই। নারায়ণীর ভূমিকা নাকি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় লিখিয়াছেন— থিয়েটারের অভিনেতা, অভিনেত্রীরা পার্কস্ট্রীটের বাড়ির অভিনয় দেখিয়া যায়, এবং কয়েক দিন পরে এমারেল্ডে যে অভিনয় হয় তাহাতে অভিনেত্রীরা ঠাকুরবাড়ির অভিনয়ের ঢং আশ্চর্যরূপে অনুকরণ করিয়াছিল।

বিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠে বিদ্যালাভের বেদনা কবির মনে সততই জাগরূক ছিল। শিক্ষায় গতানুগতিকতার অনুবর্তনে তাঁহার কিছুমাত্র নিষ্ঠা ছিল না। আদর্শ শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ তাই স্বীয় আদর্শে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়া শান্তিনিকেতনে ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষে আদর্শ বিদ্যালয়— ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। শিলাইদহে যে আদর্শে কবি গৃহবিদ্যালয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, এই আশ্রম তাহারই পূর্ণ পরিণত প্রতিষ্ঠান। মহর্ষির দীক্ষাগ্রহণের দিন ৭ই পৌষ, আশ্রমপ্রতিষ্ঠা-হেতু কবিবরেরও জীবনেতিহাসের স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিবস।

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার সময় কবির বিশেষ অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল। ঋণগ্রস্ত হইয়া তিনি বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেন। পুরী-স্থিত পাকা বাড়ি এই সময়ে তিনি আশ্রম-রক্ষণার্থ বিক্রয় করিয়াছিলেন। অলংকার বিক্রয় করিয়া মৃণালিনী দেবী বিদ্যালয়ের পরিচালনায় কবির সহায়তা করিয়াছিলেন। সংকল্প সাধনার ব্যবসায় মহতেরই প্রকৃতিসিদ্ধ।…

আশ্রমের কার্যে কবির সহধর্মিণী সহকর্মিণী হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ছাত্রগণের করণীয় সকল বিষয় তত্ত্বাবধান তিনি অবশ্যকর্তব্য মনে করিতেন। পাছে বালকগণের কষ্ট হয়, এই ভাবিয়াই তিনি তাহাদের খাওয়ার ও জলখাবারের ভার নিজের হাতেই লইয়াছিলেন ও দেখিয়াশুনিয়া খাওয়াইতেন। এই অপত্যনির্বিশেষ স্নেহ তাঁহাকে বালকগণের মাতৃস্থানীয়া করিয়া রাখিয়াছিল। বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে এক আত্মীয়ের নিকটে শুনিয়াছিলাম—"আশ্রমের অধ্যাপকগণ ও বালকেরা যে প্রকার সুখে বাস করেন বাবুদের ভাগ্যেও তাহা সম্ভব হয় না। রথীন্দ্রনাথের

মনস্বিনী জননী প্রতিদিনই আশ্রমবাসীদের জন্য নিজের অভিমত নানা আহার্যের ব্যবস্থা করেন, কোনো বিষয়েই ত্রুটি হয় না।"

ভ্রাতৃভাব শিষ্টাচার সংযম নিয়মনিষ্ঠা বিলাসবর্জন প্রভৃতি আশ্রমের আদর্শভূত সদ্‌গুণে বালকগণকে শৈশব হইতে মানুষ করিয়া গড়িয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করার নিমিত্ত মৃণালিনী দেবী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার তীব্র আঘাত তাঁহার অনভ্যস্ত শরীরবন্ধ সহ্য করিতে পারিল না, ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ দেখা দিল এবং ক্রমে সাংঘাতিক রোগে পরিণত হইল। চিকিৎসার্থে তিনি কলিকাতায় নীত হইলেন ; সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় মারাত্মক রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না ; সাংঘাতিক আক্রমণে আশ্রমজননীর জীবিতকাল ক্রমে নিঃশেষ হইল।

'ধরার সঙ্গিনী'র সঙ্গ সাঙ্গ হইল! শ্বশুর স্বামী পুত্র কন্যা জামাতায় সাজানো সোনার সংসার ভাঙিয়া গেল— গৃহস্থতার অবসান হইল।

প্রায় দুই মাস মৃণালিনী দেবী শয্যাশায়িনী ছিলেন। রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া কবি এই দীর্ঘকাল পীড়িত পত্নীর যেরূপ সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা কদাচিৎ কোনো সৌভাগ্যবতী আয়ুষ্মতীর ভাগ্যে সম্ভব হয়। অর্থ-বিনিময়ে সেবাকারিণীর অসদ্ভাব তখন না হইলেও, তাদৃশ ব্যবস্থায় পাছে কোনো ত্রুটিতে রোগিণীর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, এই সন্দেহেই জীবনান্ত পর্যন্ত কবি পত্নীর সেবাশুশ্রূষা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক পাখা তখন ছিল না, হাতপাখার বাতাসে দিনের পর দিন কবি রোগিণীর রোগ-জ্বালা প্রশমিত করিয়াছিলেন। পতি-পত্নীর প্রণয়বন্ধনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত জীবনান্ত পর্যন্ত কবির এই অক্লান্ত সেবা।

১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ রবিবারে নিশীথসময়ে মৃণালিনী দেবী পরলোকগমন করেন। পত্নীর জীবিতাবসানের পরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া কবি একাকী ছাদে চলিয়া যান ; সমস্ত রাত্রি ছাদেই কাটিয়া যায়। পুত্র-বধূর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া মহর্ষি বলিয়াছিলেন— "রবির জন্য চিন্তা করি না,

সে লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটাতে পারবে। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যই দুঃখ হয়।"

মৃণালিনী দেবী যখন শয্যাগত, সেই সময়ে তাঁহার পিসিমার সপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁহাকে দেখিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সপত্নী হইলেও মৃণালিনী দেবীর প্রতি আপন পিসিমার মতোই তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। সেই সময় ভাইঝি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— "পিসিমা, আমি শয্যাগত, ছেলে-মেয়েদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তাদের দেখাশুনা করার কেউ নেই, তাদের ভার নিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।" পিসিমা ভাইঝির কথা রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি সংসারে থাকিয়া শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতনে কবির নূতন বাড়িতে সংসারের ভার লইয়া তিনি শিশুদের প্রতিপালন করিয়াছেন দেখিয়াছি। মীরা শমী তখন শিশু।

পত্নীর পরলোকগমনে কবির প্রণয়প্রবণ হৃদয়ে বিচ্ছেদবেদনা যে নিদারুণ আঘাত দিয়াছিল, পত্নীস্মরণে রচিত 'স্মরণ'-এর সন্তাপময়ী ভাষার কবিতায় পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে তাহা অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে।

"মৃণালিনী দেবী"
'কবির কথা', ১৩৬১. পৃ. ৬৪

৩. ইন্দিরা দেবী

পারিবারিক স্মৃতির কথা বলতে গেলে প্রথমেই পরিবার পত্তন বা বিয়ের কথা তুলতে হয়। যশোর জেলা সেকালে ছিল ঠাকুরবংশের ভবিষ্যৎ গৃহিণীদের প্রধান আকর। কারণ সে দেশে ছিল পিরালী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল। শুনেছি সেখানকার মেয়েদের রূপেরও সুখ্যাতি ছিল, যদিও

পুরনো দাসী পাঠিয়ে তাদের স্বচ্ছন্দে নির্বাচন করে আনা হত। পূর্বপ্রথানুসারে রবিকাকার কনে খুঁজতেও তাঁর বউঠাকুরানীরা, তার মানে মা আর নতুনকাকিমা, জ্যোতিকাকামশায় আর রবিকাকাকে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যশোর যাত্রা করলেন। বলা বাহুল্য আমরা দুই ভাইবোনেও সে-যাত্রায় বাদ পড়ি নি। যশোরে নরেন্দ্রপুর গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি। সেখানেই আমরা সদলবলে আশ্রয় নিলুম। সেই বোধ হয় আমার জীবনে প্রথম গ্রাম দেখা। পরেও এ বিষয়ে খুব বেশি অভিজ্ঞতা হয় নি। একটি বড়ো আঙিনার চারি দিকে চারটি আলাদা ঘর নিয়ে বাড়িটি তৈরি।··· যদিও এই বউ-পরিচয়ের দলে আমরা থাকতুম না, তা হলেও শুনেছি যে তাঁরা দক্ষিণডিহি চেঙ্গুটিয়া প্রভৃতি আশেপাশের গ্রামে যেখানেই একটু বিবাহ-যোগ্যা মেয়ের খোঁজ পেতেন সেখানেই সন্ধান করতে যেতেন। কিন্তু বোধ হয় তখন যশোরে সুন্দরী মেয়ের আকাল পড়েছিল, কারণ এত খোঁজ করেও বউঠাকুরানীরা মনের মতো কনে খুঁজে পেলেন না। আবার নিতান্ত বালিকা হলেও তো চলবে না। তাই অবশেষে তাঁরা জোড়াসাঁকোর কাছারির একজন কর্মচারী বেণী রায় মশায়ের অপেক্ষাকৃত বয়স্থা কন্যাকেই মনোনীত করলেন। তাঁর বাপের বাড়ির নাম ছিল ভবতারিণী, শ্বশুরবাড়ি এসে তাঁর নাম বদলে মৃণালিনী রাখা হল, বোধ হয় বরের নামের সঙ্গে মিলিয়ে। রূপে না হলেও গুণে তিনি পরবর্তী জীবনে শ্বশুর বাড়ির সকলকে আপন করতে পেরেছিলেন, এ কথা সেকালের অনেকেই জানেন।

এই যশোরযাত্রার যে বীজ বপন করা হয় সেটির ফল ফলে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে। রবিকা'র বয়স যখন বছর-বাইশেক হবে, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে বোম্বাইয়ের কারোয়ার বন্দরে ছিলেন। সেখানে থাকতেই বিয়ের জন্যে বাড়ি থেকে তাঁর ডাক পড়ে।···

কাকিমার কথা আগেই বলেছি যে, তিনি স্নেহমমতাময় আমুদে মিশুক প্রকৃতির গুণে পরিবারের সকলকে সহজেই আপন করতে পেরে-

ছিলেন। আমার মনে হয় যশোরের মেয়েরাই সাধারণভাবে এই গুণ-গুলির অধিকারিণী ছিলেন। বিশেষত, রাঁধাবাড়া সম্বন্ধে কাকিমার খুব শখ ছিল। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরাতেও তা সংক্রামিত হয়েছে। শুনেছি, শান্তিনিকেতনে থাকার সময় আশ্রমের ছেলেদের জন্য আগুন-তাতে রেঁধে রেঁধেই কাকিমার শেষ অসুখের সূত্রপাত হয়। আর শুনেছি রবিকা'র জমিদারি পরিদর্শনের জন্য শিলাইদহের কুঠিতে থাকা কালে নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি যখন তাঁদের অতিথি হতেন তখন আর কোনোরকম মিষ্টান্ন না পেয়ে কাকিমা এমন সুন্দর গাজরের হালুয়া তৈরি করতেন যে তাতেই তাঁরা পরিতুষ্ট হয়ে যেতেন।

'রবীন্দ্রস্মৃতি', ১৩৮০, পৃ. ৫৪-৫৬

৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিকাকার বিয়ে আর হয় না ; সবাই বলেন 'বিয়ে করো—বিয়ে করো এবারে', রবিকাকা রাজী হন না, চুপ করে ঘাড় হেঁট করে থাকেন। শেষে তাঁকে তো সবাই মিলে বুঝিয়ে রাজী করালেন। রথীর মা যশোরের মেয়ে। তোমরা জানো ওঁর নাম মৃণালিনী, তা বিয়ের পরে দেওয়া নাম। আগের নাম কী একটা সুন্দরী না তারিণী দিয়ে ছিল, মা তাই বলে ডাকতেন। সেকেলে বেশ নামটি ছিল, কেন যে বদল হল। খুব সম্ভব, যতদূর এখন বুঝি, রবিকাকার নামের সঙ্গে মিলিয়ে মৃণালিনী নাম রাখা হয়েছিল।

গায়েহলুদ হয়ে গেল। আইবুড়োভাত হবে। তখনকার দিনে ও বাড়ির কোনো ছেলের গায়েহলুদ হয়ে গেলেই এ বাড়িতে তাকে নেমন্তন্ন করে প্রথম আইবুড়োভাত খাওয়ানো হত। তার পর এ-বাড়ি ও-বাড়ি চলত কয়দিন ধরে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন। মা গায়েহলুদের পরে রবিকাকাকে

আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন করলেন। মা খুব খুশি, একে যশোরের মেয়ে, তায় রথীর মা মার সম্পর্কের বোন। খুব ধুমধামে খাওয়ার ব্যবস্থা হল। রবিকাকা খেতে বসেছেন, উপরে আমার বড়োপিসিমা কাদম্বিনী দেবীর ঘরে, সামনে আইবুড়োভাত সাজানো হয়েছে— বিরাট আয়োজন। পিসিমারা রবিকাকাকে ঘিরে বসেছেন, এ আমাদের নিজের চোখে দেখা। রবিকাকা দোড়দার শাল গায়ে, লাল কি সবুজ রঙের মনে নেই, তবে খুব জমকালো রঙচঙের। বুঝে দেখো, একে রবিকাকা, তায় ওই সাজ, দেখাচ্ছে যেন দিল্লীর বাদশা। তখনই ওঁর কবি বলে খ্যাতি, পিসিমারা জিজ্ঞেস করছেন, কী রে, বউকে দেখেছিস, পছন্দ হয়েছে, কেমন হবে বউ, ইত্যাদি সব। রবিকাকা ঘাড় হেঁট করে বসে একটু করে খাবার মুখে দিচ্ছেন, আর লজ্জায় মুখে কথাটি নেই। সে মূর্তি তোমরা আর দেখতে পাবে না, বুঝতেও পারবে না বললে—ওই আমরাই যা দেখে নিয়েছি।

'ঘরোয়া', ১৩৭৭, পৃ. ১০৬-০৭

৫. হেমলতা ঠাকুর

১

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় শীতকালে অগ্রহায়ণ মাসে। দিন-তারিখ ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০। বিবাহ হয়েছিল তাঁর নিজের বাড়িতে। বিয়ে করতে যেতে হয় নি তাঁকে শ্বশুরবাড়ি। পরিবারের বড়ো ছেলের ও ছোটো ছেলের বিয়ে বাপ-মা'রা ঘটা করে দিয়ে থাকেন। তাঁদের প্রথম কাজ ও শেষ কাজ বলে। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের শেষ পুত্র। মা নাই— আড়ম্বরে উদাসীন পিতা তখন হিমালয়বাসী। বিয়েতে ঘটা করে কে। ঘরের ছেলে নিতান্ত সাধারণ ঘরোয়াভাবে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল। ধুমধামের সম্পর্ক ছিল না তার মধ্যে। পারিবারিক বেনারসী শাল ছিল একখানি— যার যখন

বিয়ে হত সেইখানি ছিল বরসজ্জার উপকরণ। নিজেরই বাড়িতে পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করতে এলেন অন্দরমহলে— স্ত্রী-আচারের সরঞ্জাম যেখানে সাজানো। বরসজ্জার শালখানি গায়ে জড়ানো রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন পিঁড়ির উপর। নতুন কাকিমার আত্মীয়া যাঁকে সবাই ডাকতেন 'বড় গাঙ্গুলির স্ত্রী' বলে— রবীন্দ্রনাথকে বরণ করলেন তিনি। তাঁর পরনে ছিল একখানি কালো রঙের বেনারসী জরির ডুরে।

বিয়ের সময় কাকিমা ছিলেন খুব রোগা। গ্রামের বালিকা, শহুরে হাবভাব কিছুই জানতেন না। কী মানুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হচ্ছে···কত বড় আশ্চর্য মানুষ, কাকে তিনি পেলেন, এর কোনো ধারণাই তাঁর ছিল না। কনে এনে সাত পাক ঘুরানো হল— শেষে বরকনে দালানে চললেন সম্প্রদানস্থলে। বাড়ির অবিবাহিত বড়ো মেয়েগুলি সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমিও জুটে গেলুম তাদের সঙ্গে। দালানের এক ধারে বসবার জায়গা ছিল আমাদের। দেখলুম সেখানে বসে স্বচক্ষে কাকিমার সম্প্রদান।

সম্প্রদানের পর বরকনে এসে বাসরে বসলেন। রবীন্দ্রনাথের বউ এলে তার থাকবার জন্যে একটি ঘর নির্দিষ্ট করা ছিল আগে থেকেই। বাসর বসলো সেই ঘরেই। বাসরে বসেই রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমি আরম্ভ করলেন। ভাঁড়-কুলো খেলা আরম্ভ হল, ভাঁড়ের চালগুলি ঢালা-ভরাই হল ভাঁড়-খেলা। রবীন্দ্রনাথ ভাঁড় খেলার বদলে ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগলেন ধরে ধরে। তাঁর ছোটো কাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী বলে উঠলেন,

ওকি করিস রবি ? এই বুঝি তোর ভাঁড়খেলা ? ভাঁড়গুলো সব উল্টে-পাল্টে দিচ্ছিস কেন ?

রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ি— নিজেই বর। তাঁকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয় নি। তাই তাঁর লজ্জা সংকোচের কারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বললেন,

জানো না কাকিমা— সব যে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে— কাজেই আমি ভাঁড়গুলো উলটে দিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ বাক্‌সিদ্ধ মানুষ, কথায় তাঁকে হারাতে পারবে না কেউ। তাঁর কাকিমা আবার বললেন,

তুই একটা গান কর। তোর বাসরে আর কে গাইবে, তুই এমন গাইয়ে থাকতে ?

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তখন কী চমৎকার ছিল, সে যারা না শুনেছে বুঝতে পারবে না। আমরা যে কানে শুনেছি সে আমাদের কম সৌভাগ্য নয়। এখন সবই হারিয়ে গেছে, তবু যা পেয়েছি তাই রেখেছি মনে ধরে।

বাসরে গান জুড়ে দিলেন—

আ মরি লাবণ্যময়ী
    কে ও স্থির সৌদামিনী,
পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে
    মার্জিত বদনখানি !
নেহারিয়া রূপ হায়,
আঁখি না ফিরিতে চায়,
অপ্সরা কি বিদ্যাধরী
    কে রূপসী নাহি জানি।

দুষ্টুমি করে গাইতে লাগলেন কাকিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বেচারী কাকিমা রবীন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখে জড়োসড়ো। ওড়নায় মুখ ঢেকে মাথা হেঁট করে বসে আছেন। আরও একটা গান তখন গেয়েছিলেন— সেটা আমার স্মরণ নাই। সেদিনকার পালা ওখানেই শেষ।

কাকিমা প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন— মাত্র ১ বৎসরের বড়ো আমার থেকে। তাই তাঁর সাথে আমাদের বেশ ভাব জমেছিল পরে। নানারকম ছেলেমানুষি গল্প হত খুব। নতুন কাকিমার এক বোনঝি নীরজা থাকতেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, তিনিও আমাদের গল্পের দলের একজন। কাকিমার

বিবাহের তিন মাস পরে আরেকটি ঘটনা না বলে পারছি না। ন'পিসিমার প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ীর বিবাহ। গায়েহলুদে দুপুরে আমরা নিমন্ত্রণে গিয়েছি। মধ্যাহ্নভোজনে বসতে প্রায় একটা বেজে গেল। খেয়ে উঠতে দুটো। সেই সময়ে কলকাতা মিউজিয়মে প্রদর্শনী খুলেছে নূতন। সেই প্রথম কলকাতায় প্রদর্শনীর প্রচলন। তিনটের সময় প্রদর্শনীতে যাবার জন্যে সকলে প্রস্তুত, আমরাও বাড়ি ফেরবার মুখে। মেজো কাকিমার সঙ্গে কাকিমাও যাবেন প্রদর্শনীতে। বাসন্তী রঙের জমিতে লাল ফিতের উপর জরির কাজ করা পাড় বসানো শাড়ি পরেছেন কাকিমা। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। কথায় বলে বিয়ের জল গায়ে পড়লে মেয়েরা সুন্দর হয়ে বেড়ে ওঠে। সেই রোগা কাকিমা দিব্যি দোহারা হয়ে উঠেছেন তখন। রবীন্দ্রনাথ কোথা থেকে এসে জুটলেন সেই সময় সেইখানে হাতে একটা প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি নিয়ে খেতে খেতে। কাকিমাকে সুসজ্জিত বেশে দেখে দুষ্টুমি করে গান জুড়ে দিলেন তাঁকে অপ্রস্তুত করবার জন্যে—

হৃদয়কাননে ফুল ফোটাও,
আধো নয়নে সখি, চাও চাও!

এমন চড়া সুরে ধরেছেন যে জোর পৌঁছে যায় সবার কানে—

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসো হে,
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসো হে।
হৃদয়কাননে ফুল ফোটাও,
আধো নয়নে সখি, চাও চাও—
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসো হে।

"রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর"
'সমকালীন', বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ. ৯-২১

২

সংগীতের সুরসাধনায় ও কাব্যের ছন্দযোজনায় কবি যেমন বাঁধা পথ অনুসরণ করে চলেন নাই, সংসার-পরিচালনায়ও তেমনি সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বাঁধা পথ ধরে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে চলতে দিতে চান নাই। কবিপত্নী ছেলেদের দামি পোশাক পরাতে গেলে কবি বোঝাতেন, বড়োমানুষির আওতায় থাকলে ছেলে মানুষ হয় না, অভ্যাসে তার গলদ জমে ওঠে অনেক। তোমার সন্তানরা খুব ভালো করে যাতে মানুষ হয় তারই চেষ্টা করছি। শুনে কবিপত্নী খুশি হতেন, গৌরব অনুভব করতেন, কিন্তু মনে মনে লুকিয়ে থাকত ছেলেদের সুন্দর সুন্দর দামি পোশাকে সাজাবার সাধ। আশপাশের মানুষদের কাছে সেটি প্রকাশ হয়ে পড়ত দু-এক কথায়। তবে কার্যত তিনি স্বামীর আদর্শই অনুসরণ করে চলতেন।

সাধারণ লোকদের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার জন্য কবি আগ্রহ প্রকাশ করতেন খুব— না পারলে মনে কষ্ট পেতেন ও খেদ করতেন। নিজেকে ভেঙে গড়তে চাইতেন তাদের মতো অভ্যাসে অভ্যস্ত করার জন্য। বিদ্যালয়-স্থাপনার পরে ছাত্রদের মধ্যে থাকবেন বলে শান্তিনিকেতনের বর্তমান লাইব্রেরি-বাড়ির এক পাশের একটি ঘরে কবি বাস করেছেন অনেক দিন, খেতেন ছাত্রদের খাওয়ার সারে বসে— এক সঙ্গে একই খাদ্য।

কবিপত্নী স্বভাবত অতিরিক্ত সাজসজ্জার আদৌ অনুরাগী ছিলেন না, গহনা পরতেন নিতান্ত সামান্য। বড়ো ঘরের বৌ, তার তুলনায় তিনি সাধারণ বেশেই থাকতে ভালোবাসতেন। উপরন্তু কবির উন্নত রুচির প্রভাব তাঁকে আরো সাদাসিধা করে তুলেছিল।

বিলাস বর্জন, উপকরণ বর্জন একমাত্র বুলি ছিল সে সময় কবির মুখে। মেয়েদের কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে রূপসৃষ্টি, চোখ-ধাঁধানো রঙ-বেরঙের প্রজাপতি প্যাটার্নের সাজসজ্জা ও অলংকারবহুলতার আড়ম্বরের প্রতি ধিক্কার

দিতেন কবি প্রতি কথায়, বলতেন— অসভ্য দেশের মানুষরাই মুখ 'চিত্তির' করে। মুখে রঙ মেখে মেয়েরা কি অসভ্য দেশের মানুষ সাজতে চায়?

আমাদের ধরাধরিতে একদিন কবিপত্নী কানে দুটি দুল ঝোলানো বীরবৌলি পরেছিলেন, হঠাৎ কবি এসে পড়েন সেই সময় ঘরে, কবির প্রবেশমাত্র লজ্জা পেয়ে তিনি দুই কানে দুই হাত চাপা দিলেন। টানাটানি করে আমরা হাত নামাতে পারলাম না কিছুতেই। তিনি এত কম গহনা ব্যবহার করতেন যে দুটি বীরবৌলি কানে পরেই লজ্জা পেলেন খুব বেশি। সমবয়সী বৌদের সাজতে বলবেন কিন্তু নিজে সাজবেন না এই ছিল তাঁর ভাব। 'বড়ো বড়ো ভাসুরপো ভাগ্নেরা চারি দিকে ঘুরছে— আমি আবার সাজব কি'— তাঁর নিজের মুখের কথা।

কবি, পিতার শেষ সন্তান বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় ও সমবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল তাঁর কয়েকজন।

কবিপত্নী একবার সাধ করে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন বলে। কবি দেখে বলেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো সোনা পরে— লজ্জার কথা! তোমাদের চমৎকার রুচি! কবিপত্নী সে বোতাম ভেঙে ওপাল-বসানো বোতাম গড়িয়ে দিলেন। দু-চার বার কবি সেটি ব্যবহার করেছিলেন যেন দায়ে পড়ে। কবির পছন্দ সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র— বুঝতে সময় লাগে।

বিদ্যালয়-সূচনার পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সাবেক বড়ো কুঠিটিতে কবির পরিবার ও আমরা একত্র বাস করেছি অনেক সময়। গৃহস্থালির ভার থাকত কবিপত্নীর, তাঁকে গৃহকর্মে সাহায্য করার ভার আমার। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ, ব্যয়ের হিসাব রাখার ভার আমার স্বামীর। খাওয়া হত চমৎকার, কবিপত্নীর রান্নার ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুতের বিরাম ছিল না একদিনও। কবি থেকে থেকে পত্নীকে বলতেন, "নীচে বসে লিখতে লিখতে রোজ শুনি, চাই ঘি, চাই সুজি, চিনি চিঁড়ে

ময়দা, মিষ্টি তৈরি হবে। যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ, মজা হয়েছে খুব।" আমার স্বামীর নাম করে বলতেন, "সে তো কখনো 'না' বলবে না। যত চাইবে ততই দেবে। তার মতো কর্তা ও তোমার মতো গিন্নী হলেই হয়েছে আর কি, দু-দিনে ফতুর।" কবিপত্নী ভাসুরপুত্রের (আমার স্বামীর) নাম করে বলতেন, "সে সংসার বোঝে, তার সঙ্গে কাজ করে সুখ, তোমার এদিকে নজর দেওয়া কেন।"

কবিপত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার। ব্যঞ্জনাদির স্বাদ ও মিষ্টান্নাদির পাক তাঁর হাতে উৎরাত উৎকৃষ্ট হয়ে। কবির জন্য প্রায়ই তিনি ঘরে নানানতরো মিষ্টান্ন তৈরি করতেন নিজের হাতে। চিঁড়ের পুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই তাঁর হাতের একবার যাঁরা খেয়েছেন তাঁরা আর ভোলেন নাই। নাটোরের ভূতপূর্ব মহারাজা স্বর্গীয় জগদিন্দ্রনাথ রায় কবিপত্নীর হাতের তৈরি দইয়ের মালপোর ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের শখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ-সম্বন্ধে তাঁর শখ বাড়িয়ে দিত বেশি। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে বসে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেক বার। শুধু ফরমাস করেই ক্ষান্ত হতেন না, নূতন মালমসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি শখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব করে বলতেন, "দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।" তিনি চটে গিয়ে বলতেন, "তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।"

সংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে কাছের লোকে চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারত না। করো চিন্তা, বলো যা খুশি, কবি নিজের ইচ্ছায় ভর করেই চলেছেন। জন্ম হতে অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় শরীর তখন এই-সব উপদ্রব সহ্য করেছে অনেকটা অনায়াসে। ঘরের লোকের

ধারণা, খেয়ালের বশে কবি স্বল্পাহারে শরীর নষ্ট করছেন; কাজেই এই ব্যাপার তাঁরা উপদ্রব বলেই গণ্য করতেন। কবি যে শরীরের উপযোগী খাদ্য না খুঁজে মনের উপযোগী খাদ্য খুঁজে নিচ্ছেন এ কথা বোঝা যেত না তখন স্পষ্ট করে। ঘরের মানুষ— যাঁদের লক্ষ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি, তাঁরা এমনতরো ঝোঁকালো লোক নিয়ে বেগ পেতেন সর্বদা। স্বল্পাহারের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা অনেক সময় কবি-পত্নীকে বলতাম, "বলুন-না কাকিমা কাকামহাশয়কে বলকারক খাদ্য কিছু খেতে।" কবিপত্নী বলতেন, "তোমরা চেনো না, বললে জেদ আরো বাড়বে; না খেয়ে দুর্বল হয়ে সিঁড়ি উঠতে মাথা ঘুরে পড়ুন আগে, তার পরে নিজেই শিখবেন—কারো শেখানো কথা শোনবার ধাতের মানুষ নন।"

কবি বহু বৎসর নিরামিষভোজী ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর ঘরে যখন কবি নিরামিষভোজী, এমন-কি সময়ে সময়ে অন্নত্যাগ করে শুধু ছোলা ভিজানো, মুগডাল ভিজানো খেয়ে দিন কাটান, তখন কার্যসূত্রে মাঝে মাঝে কবিকে পতিসরে যেতে হত। কবির শাশুড়ী ঠাকুরানী তখন নিজগ্রাম যশোহর জেলার অন্তর্গত ফুলতলা ছেড়ে পুত্রের কর্মস্থান পতিসরে বাস করতেন। তিনি স্বহস্তে মাছের ব্যঞ্জনাদি রান্না করে জামাতার পাতে দিলে কবি 'না' বলতেন না। কন্যা নাই, পাছে তিনি মনে কষ্ট পান ভেবে নিজের ইচ্ছা সেখানে কবি খর্ব করতেন। সঙ্গের ভৃত্য উমাচরণ ফিরে এসে আমাদের কাছে গল্প করত, "এখানে বাবুমশায় খাওয়া নিয়ে এত গোলমাল করেন, পতিসরে কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুন যা দেন তাই খান; একটি কথা বলেন না— শাশুড়ী কিনা!"

ভৃত্যরা খুশি মনে সহজভাবে কবির সামনে কথা বলে, কবি সেটা ভালো-বাসেন চিরদিন। ভয় পেয়ে ভৃত্য কাজ করবে তিনি আদৌ পছন্দ করেন না।

শান্তিনিকেতন কুঠির দোতলায় একদিন বিকেলে চায়ের টেবিলে কবি চা খেতে বসেছেন, ঘরে ভালো মিষ্টি কাকামহাশয়ের জন্যে তৈরি করা হোক

মৃণালিনী দেবী

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুমোদিত চিত্র। পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

approved.
One dozen required
R Tagore

বলায় কবি হঠাৎ বলে ফেললেন, "ঘরের মিষ্টি আর আমার দরকার নাই।" বুঝলুম কাকিমার হাতের মিষ্টির কথা মনে পড়ে তাঁকে ব্যথা দিল। অন্তরের ব্যথা খুব চেপে রাখেন কবি, কেমন করে সেদিন কথাটুকু মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছিল।

এইবার উপকরণ-বর্জনের পালা। সংসার-সরঞ্জাম সব-কিছু ফেলে চলো যে-পথে কবি চলেন সেই পথে কবির সঙ্গে। সংসার-সঙ্গিনীর প্রতি এই ছিল তাঁর আর-এক দিকের আর-এক ভাবের কথা।

উপকরণের বোঝা বয়ে চলা সম্বন্ধে কবির মনে গভীর বিরাগ ছিল গোড়া থেকে। মনের চেতনা যাঁদের সূক্ষ্ম, উপকরণের ভার তাঁরা সইতে পারেন না, দুঃখ পান তাই নিয়ে। ঘরছাড়া কবি ঘর ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধতে গেছেন কয়েকবার। যাত্রাকালে কবির মুখে এক কথা— উপকরণ আবর্জনা ফেলে যাও, ওদের সঙ্গের সাথী কোরো না। ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিস— বঁটি, কাটারি, কুরুনি, বারকোশ, কড়া, খুন্তি, হাতার বোঝাটি সঙ্গে যাচ্ছে দেখলেই কবি হুলুস্থুল বাধাতেন। চটেমটে বলতেন, "এ-সব জঞ্জাল জড়ো করা কেন?" যেন দুখানি বস্ত্র হাতে নিয়ে বেরোতে পারলেই ভালো হয় কবির মতে।

পথযাত্রায় গৃহস্থালি সরঞ্জাম দু-একটি বেশি সঙ্গে নেওয়ার দিকে মেয়েদের ঝোঁক, পুরুষদের দৃষ্টিতে যেগুলি অনাবশ্যক ঠেকে। বোঝা বাড়াও কেন, পুরুষদের কথা। সময়কালে অভাবে ঠেকতে না হয়, মেয়েদের ভাব। প্রায় সকল বাড়ির মেয়েই যাত্রাকালে বাবুদের লুকিয়ে ব্যবহার্য দু-একটি জিনিস সঙ্গে নিয়ে থাকেন। কবির সংসারেও তার ব্যতিক্রম হত না, কবিপত্নীও কতকগুলি সরঞ্জাম সঙ্গে নিতেন লুকিয়ে। কৌতুক করে আমাদের কাছে আড়ালে বলতেন, "দেখ তো বাপু, এমন লোক নিয়ে কী করে ঘর করা যায়। ফেলে তো যাব সব, এদিকে গিয়েই কিন্তু অতিথি-সমাগমের ধুম পড়ে যাবে। অতিথির কারবার তো কবির কম নয়, তখন আনো মালপো,

আনো মিঠাই, ভাজো শিঙাড়া, ভাজো নিমকি, কচুরি, তাও আবার কম হলে চলবে না, পাত্র বোঝাই প্রচুর হওয়া চাই। সরঞ্জাম না হলে জিনিস আসবে কোথা থেকে সে কথা বলে কে।"

কবি আদর্শের টানে নানা সময়ে নানা ভাবে নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলতে মনে কোনো দ্বিধা রাখতেন না। আদর্শপ্রবণতা তাঁকে কোথায় কখন কোন্ সংকটে জড়িয়ে ফেলে, এ ভাবনা কবিপত্নীর মনে থাকত। কবি ও কবির পরিবার অভিন্ন ; কবি বিপন্ন হলে পরিবারটিরও বিপন্ন-হওয়া স্বাভাবিক।

স্বামী-সন্তানের দেহমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ রাখা পত্নী ও জননীর স্বাভাবিক ধর্ম। সকল জননী, পত্নীর মনে এই আদর্শ জাগ্রত। সংরক্ষণের পথেই এই আদর্শের গতি। পুরুষ ছড়ায়, নারী কুড়ায়, বাঁচায়। ঘরে বাইরে পুরুষ ও নারীর এই আদর্শ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টিরহস্যের এক বিশেষ অধ্যায়।

কবির মুখে 'ফেলো ফেলো ছাড়ো ছাড়ো' শুনে কবিপত্নী বলতেন, ঘরকন্না ফেঁদে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসার করতে গেলে, এক কথায় ফকির সাজা চলে না। পতি-পত্নীর মধ্যে হৃদয়ের ব্যবধান থাকা সম্ভব নয়। একের ভাবে অন্যের যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কবির ভাব কবিপত্নী অনুপ্রাণিত না হয়ে পারেন নাই।

শিক্ষাব্রতী কবি আদর্শ শিক্ষালয় গঠনের যখন প্রবৃত্ত, কবির সহধর্মিণী তখন সহকর্মিণী হয়েছিলেন তাঁর সে কাজে। ছাত্রদের জলখাবার তৈরির ভাব নিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে। স্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলিকে। বিদ্যালয় আরম্ভের একটি বৎসর শেষ না হতেই বিদ্যালয়ের জননী কবিপত্নীর আয়ু হল শেষ। কবির সংসার ভেঙে দিয়ে তিনি চলে গেলেন অকালে। মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করে-ছিলেন তার ছাপটি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে পরিবারের সকলের মনে আজও।

প্রায় দু-মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন ; ভাড়া-করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রূষার ভার কবি এক দিনের জন্যও দেন নাই।

স্বামীর সেবা পাওয়া কত সৌভাগ্যের, সাধ্বী নারীমাত্রই জানেন। পত্নীর প্রতি স্নেহ কবির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষ শয্যায় চূড়ান্তরূপে। তখন ইলেকট্রিক ফ্যানের সৃষ্টি হয় নি দেশে। হাতপাখা হাতে ধরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পত্নীকে কবি বাতাস দিতেন, এক মুহূর্ত হাতের পাখা না ফেলে। ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণীর প্রচলন তখন ঘরে ঘরে ; কবির ঘরে তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম।

মায়ের বাড়াবাড়ি রোগের সময় ছেলেগুলিকে রেখে গিয়েছিলেন কবি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে। আচ্ছন্ন অবস্থায় কবিপত্নী অনেকবার বলতেন, "আমাকে বলেন ঘুমাও ঘুমাও, শমীকে রেখে এলেন বিদ্যালয়ে, আমি কি ঘুমাতে পারি তাকে ছেড়ে ! বোঝেন না সেটা !" জননীর শেষ সন্তান শমী তখন শিশু। ছেলেদের সে সময় যত্নে ও সাবধানে রাখার পক্ষে তাঁর বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান, কবি বুঝেছিলেন। মৃত্যুর ছায়া তাদের মনে ঘনিয়ে আসবে সেটা যেন কবি সইতে পারতেন না।

সন্তানস্নেহ কবির অপরিমেয়। প্রথম সন্তান কন্যাটিকে পিতা হয়েও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরূপে। পত্নীর বয়স ছিল কম, কবি যেন ভরসা পেতেন না, প্রথম সন্তানের সম্যক্ যত্ন পাছে তিনি করতে না পারেন ভেবে। শিশুকে দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো, কবি সব করতেন নিজের হাতে। এ-সবই আমাদের চোখে দেখা।

সন ১৩০৯ সালে ৭ই অগ্রহায়ণ (২৩ নবেম্বর, ১৯০২) রবিবার, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক ১১ মাস পরে, মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে কবিপত্নী পরলোক গমন করেন, আমি সেদিন অসুস্থ, শয্যাশায়ী। নিজে সে সময়ে যেতে পারি নি ; রাত্রে আমার স্বামী এসে বললেন, "খুড়ির মৃত্যু হয়েছে, কাকামশাই একলা ছাদে চলে গেছেন, বারণ করেছেন

কাউকে কাছে যেতে।" প্রায় সারারাত কবি ছাদে পায়চারি করে কাটিয়েছেন শোনা গেল। কবির পিতা মহর্ষিদেব তখন জীবিত। পুত্রের পত্নীবিয়োগের সংবাদে তিনি বলেন, "রবির জন্য আমি চিন্তা করি না, লেখাপড়া নিজের রচনা নিয়ে সে দিন কাটাতে পারবে। ছোটো ছেলে-মেয়েগুলির জন্যই দুঃখ হয়।" ভাগ্যবতী কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী শ্বশুর স্বামী পুত্র কন্যা জামাতা পরিবেষ্টিত সাজানো সংসার ফেলে গেলেন—কবির সংসার গেল ভেঙে। সেই থেকে নিজের ভাঙা সংসার টেনে নিয়ে চলে আসছেন কবি এ পর্যন্ত। অসংখ্য ভাঙাচোরার বোঝা বুকে নিয়ে কবির সেই ভাঙা সংসার আজ বিশ্বভারতীর বিরাট্‌ পর্বে হতে চলেছে পরিসমাপ্ত।

"সংসারী রবীন্দ্রনাথ"
'প্রবাসী', পৌষ ১৩৬৪, পৃ. ৩০২-০৭

৬. ঊর্মিলা দেবী

আমার দিদি প্রায়ই জোড়াসাঁকোয় যেতেন, কখনো একসঙ্গে দু-তিন মাসও থেকেছেন। আমার ভারি হিংসে হত, কিন্তু কিছু বলার সাহস ছিল না। তাই তিনি যেদিন বললেন "যাবি আমার সঙ্গে জোড়াসাঁকোয়?" সেদিন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলুম। কতকালের অভীপ্সিত দিন আজ। আমি যাব ঠাকুরবাড়ি! সে-বাড়ির কত কথা কত গল্প যে শুনেছি তার ঠিক নেই। সে-বাড়ির মেয়ে-বউরা অপ্সরার মতো দেখতে, তাঁরা দুধ দিয়ে স্নান করেন, ক্ষীর সর ছানা বেটে রূপটান মাখেন— কত গয়না, কত কাপড় যে আটপৌরে পরেন তার ঠিক নেই! সে-বাড়ি যাব, তাঁদের-সব দেখব, আবার সঙ্গিনীদের কাছে গল্প করব! আর চাই কী! সবচেয়ে বড়ো কথা

কবিপ্রিয়াকে দেখব। সেদিনের কথাটি এখনো বেশ মনে আছে। দিদি যাঁর কাছে আমায় নিয়ে গিয়ে বললেন "কাকিমা, এটি আমার ছোটবোন", যিনি আদর করে আমায় কাছে টেনে নিয়ে বললেন "তোমার নাম কী ?" তিনি নিতান্তই সাদাসিধে একখানা শাড়ি পরে বসেছিলেন। গায়ে গয়নাও তেমন দেখলুম না। সাহস করে মুখের দিকে চাইলাম— এই কবিপ্রিয়া! রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী, সেরকম তো ভালো দেখতে নন। আবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম। তখন দেখি এক অপরূপ লাবণ্যে সমস্ত মুখখানা যেন ঢল ঢল করছে, আর একটা মাতৃত্বের আভায় যেন মুখখানা উজ্জ্বল। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়। সেই প্রথম দিন থেকেই আমি তাঁর অনুগত হয়ে পড়লাম। তার পর প্রায়ই সে-বাড়ি গিয়েছি, দিদির সঙ্গে থেকেছিও কখনো কখনো। ক্রমেই বুঝতে লাগলাম তিনি খুবই অসাধারণ নারী। যে মাতৃত্বের আভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাই দিয়ে যেন শুধু নিজের ছেলেমেয়ে নয়— আত্মীয় স্বজন দাসী-চাকর সকলকেই আপন করে রেখেছিলেন। সাজগোজ বেশি কখনো করতেন না। কবিবর মহর্ষিদেবের কনিষ্ঠ সন্তান— ভাইপো-ভাইঝিরা কেউ সমবয়সী, কেউ-বা অল্পই ছোটো; কিন্তু কবিপ্রিয়া এই সম্বন্ধের গুরুত্বটা যেন বেশ বুঝতেন। তিনি 'কাকিমা'; 'মামিমা', বড়ো বড়ো ছেলে-মেয়ে-বউদের সামনে আবার সাজ গোজ করবেন কী— এমনি যেন ভাবটা। রান্না করে মানুষ খাইয়ে বড়ো তৃপ্তি পেতেন। আমার দাদা যখনই যেতেন, সিঁড়ি থেকেই বলতে-বলতে উঠতেন "কাকিমা, আজ কিন্তু এটা খাব", "আজ কিন্তু ওটা খাব"; তক্ষুনি রান্নাঘরে গিয়ে সেটা তৈরি করতে বসতেন। কবির একটা অভ্যাস ছিল, সিঁড়ি থেকে সু-উচ্চ কণ্ঠে "ছোটোবউ ছোটোবউ" করে ডাকতে ডাকতে উঠতেন। আমার ভারি মজা লাগত শুনে, তাই বোধ হয় আজও মনে আছে।

কবি অত্যন্ত ভোজনরসিক ছিলেন। খাওয়াটা যে শুধু পেট ভরাবার জন্য নয়, তাতেও যে শিল্পীমনের যথেষ্ট খোরাক আছে, তা তাঁর খাওয়া

দেখলেই বোঝা যেত। তিনি ভোজনপ্রিয় ছিলেন না, ভোজনরসিক ছিলেন, আমার মেজদিদিও রন্ধনপটু ছিলেন, কবিকে তিনি অনেক রকম খাবার করে খাওয়াতেন। একদিন তিনি একরকম মিষ্টি করেছিলেন, আমাদের বাঙাল দেশে তাকে বলে এলোঝেলো। কবি সেটা খেয়ে খুব খুশি হলেন ও তার নাম জানতে চাইলেন। নাম শুনে তিনি নাক সিঁটকে বললেন, "এই সুন্দর জিনিসের এই নাম? আমি এর নাম দিলাম 'পরিবন্ধ'।" সেই থেকে ঐ নাম আমাদের বাড়িতে চলে এসেছে।

তখনকার দিনে তিনি গান রচনা করতেন একেবারে সুর কথা একসঙ্গে। বড়ো বারান্দায় পায়চারি করতে করতে যেই শেষ হল অমনি চিৎকার আরম্ভ করলেন, "অমলা, ও অমলা, শীগগির এসে শিখে নাও, এক্ষুনি ভুলে যাব কিন্তু।" কবিপ্রিয়া হাসতেন খুব, "এমন মানুষ আর কখনো দেখেছ অমলা, নিজের দেওয়া সুর নিজে ভুলে যায়?" কবি অমনি বলতেন, "অসাধারণ মানুষদের সবই অসাধারণ হয়, ছোটোবউ— চিনলে না তো!" আমার দিদির সঙ্গে কবিপ্রিয়ার খুব ভাব ছিল। দুজনে গল্প আরম্ভ করলে আর শেষ হত না। কবি নিজে এ নিয়ে খুব কৌতুক করতেন। একদিন হয়েছে কি, কবি তাঁর ঘরে টেবিলে বসে লেখাপড়া করছেন আর শোবার ঘরে তাঁদের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কবিপ্রিয়া আর আমার দিদি খুব গল্প করছেন; এমন তন্ময় হয়ে গেছেন যে, কবি কখন যে এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছেন কেউ টের পাননি। হঠাৎ মাথার কাছ থেকে বলে উঠলেন, "আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? আমার ঘুম পায় না?" যেমন কথা কানে গেছে দিদি তো বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে দে-ছুট উঠিপড়ি করে। কবি তখন খুব হাসছেন আর বলছেন, "অমলা, ও অমলা, অত ছুটো না, পড়ে যাবে যে!" আর পড়ে যাবে। একেবারে ছুটে এসে বিছানায় মুখ লুকিয়ে পড়ে আছেন। সকালবেলা দেখা হতে কবি একটু একটু হাসছেন আর বলছেন, "অত লজ্জা পাবার কী হল তোমার? আমি তো বেশ উপভোগ করছিলাম ব্যাপারটা।"

এ-সব কথা কিছু-কিছু আমার প্রত্যক্ষ, কিছুটা আমার দিদির কাছে শোনা।...

কবিপ্রিয়ার মধ্যে একটা জিনিস খুব উজ্জ্বল হয়ে ছিল, আর সেটা তাঁর জীবনপথের আলো হয়ে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। সেটি শ্বশুরের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। কতবার যে তাঁর মুখে শুনেছি, "বাবামশায়ের মত এটা নয়, আমি এ কাজ কখনো করব না।" কবির সঙ্গে তর্ক করেছেন এভাবে, "বাবামশায় এটা পছন্দ করেন না, এটা আমি করব না।" কিংবা, "বাবামশায় থাকলে তুমি একাজ করতে পারতে?" এটা যেন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। মহর্ষিদেবের সন্তানদের মধ্যে বোধ করি সব চেয়ে প্রিয় ছিলেন কনিষ্ঠটি। এই পুত্রবধূটির প্রতিও তাঁর স্নেহের অন্ত ছিল না। আর প্রগাঢ় স্নেহ ছিল রথীর প্রতি। রথীর রঙ ময়লা এটা কিছুতে মহর্ষি স্বীকার করতেন না। বলতেন, "তোমরা কী যে বল, রথী তো রবির চেয়ে ফরশা।" এ নিয়ে তাঁর সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস না পেলেও আড়ালে বেশ হাসাহাসি হত।

কবিপ্রিয়ার কিন্তু কবির উপর অখণ্ড প্রতাপ ছিল। কবি তাঁকে বেশ ভয় করতেন। তাঁর অভিমানও প্রবল ছিল, আর সে-অভিমান ভাঙতে কবিকে বেশ বেগ পেতে হত। কিন্তু এঁটে উঠতে পারতেন না তিনি তাঁর মেজ মেয়েটিকে। রানী এক অদ্ভুত মেয়ে ছিল। কি যে এক সন্ন্যাসিনীর মন নিয়ে এসে জন্মেছিল ঐশ্বর্যের মধ্যে! বিধাতার অনেক অদ্ভুত খেয়ালই বোঝা যায় না তো! খুব যে সুন্দর দেখতে ছিল তা নয়, কিন্তু চোখদুটির মধ্যে এমন একটি ভাব ছিল যে তা থেকে চোখ ফেরানো যেত না। শিশু-কাল থেকে তার সাজগোজ ভালো লাগত না, চুল বাঁধা তো একটা বিরক্তি-জনক ব্যাপার ছিল। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও তার ঔদাসীন্যের অন্ত ছিল না। মাছমাংস খাওয়ার স্পৃহামাত্র ছিল না। কিন্তু জেদ ছিল প্রচণ্ড। সে যখন এক দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়াত তখন কারো সাধ্য ছিল না

তাকে দিয়ে কিছু করায়। এজন্য শাসন সে যথেষ্ট পেত। তার মা তো একেবারে অস্থির হয়ে পড়তেন এক-এক সময়ে—"কী যে ছিষ্টিছাড়া মেয়ে জন্মেছে, আর পারি নে, বাপু।" এক-এক সময়ে বলতেন। রানী কিন্তু বকুনি শাসন শাস্তি সবেতেই অচল অটল। কবি কিন্তু তাঁর এই মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতেন, তাকে বুঝতেনও হয়তো। লেগে যেত কবিপ্রিয়ার সঙ্গে আমার দিদির সঙ্গে রানীকে নিয়ে। তিনি বলতেন, 'কাকিমা, আপনারা কেউ ওকে বোঝেন না! ওর মধ্যে যে একটা মহাপ্রাণ আছে তা আপনারা দেখেন না।" রানী যখন খোলা ছাতে মনের আনন্দে ছুটে বেড়াত, চুল-গুলো তার বাতাসে নাচত মনে হত একটি তেজী ঘোড়া যেন মুক্তির আনন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। রানী সম্বন্ধে দুটো ঘটনা খুব উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার মনে। নীতুবাবু রানীকে বড্ড ভালোবাসতেন, তার প্রত্যেক জন্মদিনে বেশ দামি দামি উপহার এনে দিতেন। একবার রানীর জন্মদিনে আমরাও গিয়েছি। 'লেড্‌ল'র বাড়ি থেকে একটা বাক্স এল নীতুবাবুর উপহার নিয়ে। বাক্স থেকে বেরোল এক বহুমূল্য ফ্রক, লেস ফ্রিল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সিল্কের ফ্রক। ফ্রকের বাহার দেখে সকলেই খুব খুশি, সকলেই খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। রানীকে ডেকে সেই ফ্রক তার গায়ে চড়ানো হল। সে হতভম্ব হয়ে আয়নার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একবার লেসগুলোতে হাত দেয় আর মুখ বাঁকায়, একবার ফ্রিলগুলো তুলে তুলে দেখে আর মুখ বাঁকায়। একটু পরে পটপট করে লেসগুলো ফ্রিলগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ফ্রকটা টেনে গা থেকে খুলে ফেলে দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে তো হুলস্থূল। তার মা আমার দিদিকে ডেকে বললেন, "ও অমলা, দেখে যাও তোমার অসাধারণ বোনটির কাণ্ড। আমি এখন নীতুকে মুখ দেখাব কী করে?"—ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমার দিদি তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে কৌচে বসলেন। সে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে রইল। একটু পরে দিদি বললেন,

"রানী, কাজটা ভালো কর নি ভাই। তোমার মা দুঃখ পেয়েছেন, তোমার নীত্‌দা শুনলে কত দুঃখ পাবেন।" সে মুখ তুলল, বিষণ্ণ দুটি চোখ মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "অমলাদি, ওরা জানে আমি এ-সব ভালোবাসি নে, এ-সব পরতে আমার কষ্ট হয়, তবু কেন আমায় ওরা জোর করে পরায় ?"

আর একবার মহাল থেকে মাছ এসেছে, সবাই ছুটে দেখতে গেছে। দুটো প্রকাণ্ড কাতলা মাছ তখনো একটু-একটু খাবি খাচ্ছে। সবাই নানা-রকম জল্পনা-কল্পনা করছে, মাছ দিয়ে কী-কী রান্না হবে। রানীও এক পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ সে আর্তস্বরে কেঁদে উঠল, "ও মা, মা গো, ঐ মাছ তোমরা খাবে ? ওরা যে এখনো বেঁচে আছে।" বলে দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে ছুটে পাশের ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কী তার কান্না !

একদিন কবি এসে বললেন, "ছোটোবউ, রানীর বিয়ে ঠিক করে এলুম, মাঝে মাত্র তিনটি দিন আছে, তার পরদিন বিয়ে।" কবিপ্রিয়া অবাক হয়ে বললেন, "তুমি বল কি গো ? এরই মধ্যে মেয়ের তুমি বিয়ে দেবে ?" কবি বললেন, "ছেলেটিকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে ছোটোবউ, যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি মিষ্টি অমায়িক স্বভাব। রানীটা যে জেদী মেয়ে, ওর বর একটু ভালোমানুষ-গোছের না হলে চলবে কেন ? আর সত্যেন বিয়ের দুদিন পরেই বিলেত চলে যাবে। সে ফিরতে ফিরতে রানী বেশ বড় হয়ে উঠবে।" কবিপ্রিয়া বললেন, "এই তিন দিনের মধ্যে সব জোগাড় কী করে হবে ?" "হবে হবে, সব হবে, কলকাতা শহরে নাকি কিছু আটকায় ? শুধু তুমি একটু প্রসন্ন মনে কাজে লেগে যাও তো, ছোটোবউ, সব ঠিক হয়ে যাবে।" হলও তাই। তবে রানীর বিয়েতে সমারোহ বেশী কিছু হল না। রানী কিন্তু এ বন্ধনটা খুব খুশি মনে নিতে পারল না, তার ভুরু একটু কুঁচকেই রইল। বিয়ের পরই বর বিদায় হবে শুনে একটু নিশ্চিন্ত হল। বিয়ের সব কাজেই সে লক্ষ্মী মেয়ের মতো মাথা নিচু করে রইল।...

এক কথায় কত কথা এসে গেল তার ঠিক নেই। যাক, আমার মনে হয়, কবিপ্রিয়া যদি অকালে না চলে যেতেন তবে কবির শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা মূর্ত হয়ে উঠত সকল দিক দিয়ে। ছেলেরা ঘর ছেড়ে এসে ঘর পেত, মাতৃস্নেহ পেত, রোগে সেবাযত্ন পেত, আর সুখে-দুঃখে সহানুভূতি পেত। কবি যে এ অভাবে কত অসহায় হয়েছিলেন তা তাঁর কথায় একদিন আমি বুঝেছিলুম। যখন আমার ছেলেকে রাখতে আমি শান্তিনিকেতনে যাই তখন আমায় বলেছিলেন, "তোমাদের ছেলেরা যে যত্নে মানুষ, এখানে কি থাকতে পারবে? এখানে অনেক কষ্ট। আমি তাদের সব দিতে পারি, মাতৃস্নেহ তো দিতে পারি না। রথীর মা সে-বিষয়ে আমায় অসহায় করে রেখে গেছেন।" তার দীর্ঘদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তখনো সে-অভাব তিনি বোধ করছেন।

কবিপ্রিয়া স্বর্গতা হবার অনেকদিন পর কী একটা কারণে কবির সংসারে একটা ক্ষণিক বিপ্লব ঘটে। তখন একদিন তিনি আমার মেজদিদিকে বলেছিলেন, "দেখো, অমলা, মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে-কথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো-একটা সমস্যায় পড়ি যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন। এবারেও আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আর আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।"

"কবিপ্রিয়া"

'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২, পৃ. ৪৪-৪৯

৭. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবা ছিলেন তাঁর নিজের ঘরে লেখাপড়া নিয়ে— মা ছিলেন তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সংসারের কাজে। সেইজন্য ছেলেবেলার কথা মনে করতে গেলে মায়ের কথাই বেশি মনে পড়ে। তাঁর নিজের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, কিন্তু তাঁর সংসার ছিল সুবৃহৎ। বাড়ির ছোটোবউ হলে কি হয়, জোড়া-সাঁকো-বাড়ির তিনিই প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন। কাকিমার কাছে সকলেই ছুটে আসত তাদের সুখদুঃখের কথা বলতে। সকলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ছিল, তিনি ছিলেন সকলের দুঃখে দুঃখী, সকলের সুখে সুখী। তাঁকে কোনোদিন কর্তৃত্ব করতে হয় নি, ভালোবাসা দিয়ে সকলের মন হরণ করেছিলেন। সেইজন্য ছোটোরা যেমন তাঁকে ভালোবাসত, বড়োরা তেমনি স্নেহ করতেন। সকলের মধ্যে বলুদাদা তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। মা কখনো ইস্কুলে লেখাপড়া শেখেন নি— বাবার কাছেই যা শিক্ষা পেয়েছিলেন। অল্পবয়স থেকেই বলুদাদা সাহিত্যরসে মাতোয়ারা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত বাংলা ইংরেজিতে যখন যে-কোনো বই পড়তেন, কাকিমাকে সেগুলি একবার পড়ে না শোনালে তাঁর তৃপ্তি হত না। বলুদাদার কাছ থেকে শুনে শুনে মায়ের এই তিন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে বেশ ভালো করেই পরিচয় হয়েছিল। বলুদাদা আমাকে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো খুব স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন আমার বালকবয়সের আদর্শ পুরুষ। সব সময়েই তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরতুম। মা স্নান করিয়ে দিতেন, কিন্তু প্রসাধন করতে যেতুম বলুদাদার কাছে।···

আমাদের তেতলার ঘরের সামনে মস্তবড়ো ছাদ। তার মাঝখানটা আবার উঁচু প্ল্যাটফর্মের মতো— যেন বাড়ির খোলা বৈঠকখানা। সমস্তদিন ধরে এখানে চলত ছেলেমেয়েদের হুটোপাটি— তাদের শিশুকণ্ঠের কলরব মুখরিত করে রাখত চার পাশ। রোদ পড়ে গেলেই চাকররা জাজিম তাকিয়া পেতে দিয়ে যেত মাঝখানে উঁচু জায়গাটায়। মেয়েদের তখন

সেখানে মজলিস বসত। চা-পান তখন চলন হয় নি। মা নানারকম মিষ্টান্ন করতে পারতেন, ঘরে যেদিন যা তৈরি করতেন সকলকে তাই বিতরণ করতেন। গ্রীষ্মকালে সেইসঙ্গে থাকত আমপোড়া শরবত।...

বাবাদের 'খামখেয়ালী সভা' যখন আরম্ভ হয় তখন আমি একটু বড়ো হয়েছি। তাই এই বৈঠকের বিষয় স্পষ্ট মনে আছে। এই সভার কোনো নিয়ম-কানুন ছিল না। পনেরো-কুড়িজন বন্ধুবান্ধব[১] মিলে এই সভা। বাবা ও বলুদাদার উৎসাহে এর প্রতিষ্ঠা হয়। সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবার কোনো নিয়ম না থাকলেও, লেখক কবি শিল্পী সংগীতজ্ঞ ও অভিনেতাদের নিয়েই সভা গঠিত হয়।... সভার প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল— প্রতি মাসে এক-একজন সভ্য পালা করে তাঁর বাড়িতে অন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন। সেদিন সেখানেই বৈঠক বসত। যদিও আহারের প্রচুর আয়োজন থাকত— কিন্তু সেটা উপলক্ষ মাত্র। কবিতা বা গল্প পড়া, ছোটোখাটো অভিনয় ও গানবাজনা করা এই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

...বাবার যেবার নিমন্ত্রণ করার পালা পড়ল, বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। মাকে ফরমাস দিলেন খাওয়ানোর সম্পূর্ণ নতুন রকম ব্যবস্থা করতে হবে। মামুলী কিছুই থাকবে না, প্রত্যেকটি পদের বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। ফরমাস করেই নিশ্চিন্ত হলেন না, নতুন ধরনের রান্না কী করে রাঁধতে হবে তাও বলে দিতে লাগলেন। মা বিপদে পড়লেন। তিনি প্রতিবাদ না করে নিজের মতে ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বাবা মনে করতেন, খাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র, রান্না ভালো হলেই হল না— খাবার পাত্র, পরিবেশনের প্রণালী, ঘর সাজানো সবই সুন্দর হওয়া চাই। যেখানে খাওয়ানো হবে

১ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রিয়নাথ সেন, চিত্তরঞ্জন দাশ, অক্ষয় চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, সন্তোষের প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতি।

তার পরিবেশে শিল্পীর হাতের পরিচয় থাকা চাই। মা রান্নার কথা ভাবতে লাগলেন, অন্যরা সাজানোর দিকে মন দিলেন।···

১৮৯৭ সালে বাংলাদেশে ভূমিকম্প হয়।··· সেই সময়ে সেবার নাটোরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফারেন্স ডাকা হয়েছিল। নাটোরের মহারাজা নিমন্ত্রণকর্তা— আমাদের বাড়ির সকলকেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে। পুরুষরা সকলেই নাটোরে চলে গেলেন। তার দুদিন বাদেই ভূমিকম্পে কলকাতা শহর তোলপাড় করে দিল। অনেক বাড়ি পড়ল, মানুষও মারা গেল। নীচে নামবার সময় ছাদ থেকে টালি ভেঙে মা'র মাথায় পড়ল। একতলায় একটা ঘরে তাঁকে শুইয়ে রাখা হল। নিজের আঘাতের যন্ত্রণা অপেক্ষা দুশ্চিন্তা তাঁর বেশি হল। বাড়িতে পুরুষ-মানুষ কেউ নেই— নাটোরে তাঁদের কী হচ্ছে খবর নেবার উপায় নেই। রেলপথ বন্ধ, টেলিগ্রাম-যাতায়াত বন্ধ।···

বাবা মনে করতেন— রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু ছেলেদের পড়ে শোনানো যায় বা তাদের হাতে পড়তে দেওয়া যায় এমন কোনো বই তখন ছিল না। ভাষার বিশেষ পরিবর্তন করে, প্রক্ষিপ্ত ও অবান্তর ঘটনা বাদ দিয়ে মূল গল্প দুটি অটুট রেখে রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করার আগ্রহ তাঁর এই সময়ে দেখা গেল। রামায়ণ সংক্ষিপ্ত করার ভার দিলেন মাকে আর মহাভারত সুরেনদাদাকে। তাঁকে বললেন কালী-প্রসন্ন সিংহের তর্জমা অবলম্বন করে সংক্ষিপ্ত করতে। রামায়ণ সম্বন্ধে কিন্তু মাকে বললেন মূল সংস্কৃত থেকে সংক্ষেপ করে তর্জমা করতে। পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহায্যে মা আগাগোড়া রামায়ণ পড়ে নিয়ে তর্জমা করতে লাগলেন। প্রয়োজনমতো বাবা পরিবর্তন বা সংশোধন করে দিতেন। একটি বাঁধানো খাতাতে কপি করে রেখেছিলেন— তার থেকে মাঝে মাঝে আমাদের পড়ে শোনাতেন। মৃত্যুর পূর্বে মা এ কাজটি সম্পূর্ণ

করে যেতে পারেন নি, তবে অল্পই বাকি ছিল। দুঃখের বিষয়, বাবার মৃত্যুর পর যখন তাঁর সমস্ত কাগজপত্র রবীন্দ্রসদনে দেওয়া হল তখন এই খাতাটি পাওয়া গেল না।

...শিলাইদহে থাকতে বাবা আমাদের লেখাপড়া শেখাবার দিকে যেমন নজর দিয়েছিলেন, অন্য দিকে মা চেষ্টা করতেন আমাদের সবরকম ঘরকন্নার কাজ শেখাতে। তাঁর প্রণালী ছিল বেশ নতুন রকমের। রবিবার দিন তিনি চাকরবামুন সকলকে ছুটি দিতেন। সংসারের সমস্ত কাজ আমাদের করতে হত। রান্নার কাজে আমার খুব উৎসাহ বোধ হত— রান্না কেমন হল, তা বোঝবার জন্য রাঁধুনির মাঝে মাঝে চেখে দেখার স্বাধীনতায় কেউ তো বাধা দিতে পারে না।

...লেখার ফাঁকে ফাঁকে যখন বাবাকে গান পেয়ে বসত— অমলা-দিদিকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেন। দিনের বেলায় অমলাদিদি মায়ের সঙ্গে রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মুখরোচক নানারকম ঢাকাই-রান্নাতে তাঁর হাতযশ ছিল— মা তাঁর কাছ থেকে সেই-সব রান্না শিখে নিতেন। আর মা শেখাতেন তাঁকে যশোহর অঞ্চলের নিরামিষ ব্যঞ্জন রাঁধার পদ্ধতি। সন্ধে হলেই, অন্য-সব কাজ ফেলে গান শোনবার জন্য সবাই সমবেত হতেন। মাঝিরা জলিবোটটা বজরার গায়ে বেঁধে দিয়ে যেত। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে জানলা দিয়ে টপকে সেই বোটটাতে গিয়ে বসতুম। সুরেনদাদার হাতে এসরাজ থাকত। জলিবোট খুলে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে নোঙর ফেলে রাখা হত। তারপর শুরু হত গান— পালা করে বাবা ও অমলাদিদি গানের পর গান গাইতে থাকতেন। আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত অবারিত জলরাশি, গানের সুরগুলি তার উপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে গিয়ে কোন্ সুদূরে যেন মিলিয়ে যেত, আবার ওপারের গাছপালার ধাক্কা খেয়ে তার মৃদু প্রতিধ্বনি আমাদের কাছে ফিরে আসত। ক্রমে রাত্রি গভীর হলে চারি দিক নিঝুম হয়ে আসত। নৌকা চলাচল তখন বন্ধ। বোটের

গায়ে থেকে-থেকে ঢেউগুলি এসে লাগছে এবং কুলুকুলু শব্দ করে স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলো পড়ে নদীর জল কোথাও কোথাও ঝিকিমিকি করে ওঠে। কখনো দু-একটা জেলে-ডিঙিতে মাঝিরা ভাটিয়ালি সুরে দাঁড় ফেলার তালে তালে গান গাইতে গাইতে চলে যায়। গানের আসর ভাঙবার আগেই আমি মার কোলে ঘুমিয়ে পড়তুম।

...বাবা সমস্তদিন ধরে লিখতেন তাঁর ঘরে— সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ— মা বারণ করে দিয়েছিলেন। লেখার ঝোঁক যখন বেশি চাপত তখন খাওয়া-দাওয়া এক-রকম ছেড়ে দিতেন। মা খুব রাগারাগি করতেন কিন্তু তাতে কোনো ফল হত না। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে: বাবা তখন সরলাদিদির উপর 'ভারতী'র সম্পাদনভার ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে তাঁর ভার লাঘব বিশেষ-কিছু হল না। লেখার জন্য তাঁর উপর দাবি সমানই থেকে গেল। প্রতিমাসেই সরলাদিদির কাছ থেকে তাগিদের চিঠি আসে। সরলাদিদি ভারতীর জন্য বাবাকে একটা প্রহসন লিখে দিতে বলেন কিন্তু বাবার সময় আর হয় না। এদিকে বড়ো লেখা না হলে সরলাদিদির চলে না, তাই তিনি গত্যন্তর না দেখে তাঁর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসলেন যে, পরের মাস থেকে ভারতীতে নিয়মিত রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রহসন বেরোবে। ভারতীর পক্ষ থেকে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি চিঠিতে বাবাকে বিজ্ঞাপনের খবরটাও জানিয়ে দিলেন। চিঠি পেয়ে বাবা প্রথমটা একটু বিরক্ত হন। কিন্তু সরলাদিদিকে বিপদগ্রস্ত করতে পারেন না, কাজেই অবিলম্বে লেখায় হাত দিলেন। 'আমি লিখতে যাচ্ছি— খাবার জন্য আমাকে ডাকাডাকি কোরো না', এই বলে তিনি লিখতে বসে গেলেন। খেতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়, তাই খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে সমস্ত দিন ধরে লিখতে লাগলেন। মা মাঝে মাঝে ফলের রস বা শরবত তাঁর টেবিলে রেখে আসতেন। যখনই এই প্রহসনের মাসিক কিস্তি পাঠাবার সময় হত, বাবা নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে লেখায় ডুবে যেতেন।

একবার এরকম একটা মাসিক কিস্তি লেখা সবেমাত্র শেষ হয়েছে, বাবা মাকে বললেন, 'আমার গল্পটা লেখা শেষ হয়ে গেছে, আমাকে এখনি কলকাতায় যেতে হবে।' এই কথা শুনে মা কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। তিনি জানতেন, কোনো লেখা শেষ হলে সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের সেটা যতক্ষণ না পড়ে শোনাচ্ছেন— বাবা স্বস্তি বোধ করতেন না। এই অভ্যাস তাঁর বরাবর থেকে গিয়েছিল। গল্পটার তখন নাম দিলেন— 'চিরকুমার সভা'। পরে এটা পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছিল 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে। এই নামটি বোধ হয় বাবার বিশেষ পছন্দ হয়নি। উপন্যাসটি যখন নাটকে পরিবর্তিত হল তখন তার নাম 'চিরকুমার সভা'ই রইল।

লেখার খাতা নিয়ে বাবা চলে গেলেন কলকাতায়। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম ও তার উপর অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে সেবার এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তেতলার ঘরে উঠতে সিঁড়িতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই ঘটনার পর খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাঁর আর স্বাধীনতা রইল না, মায়ের ব্যবস্থাই তাঁকে মেনে চলতে হত।

…ইস্কুলের বোর্ডিঙে আমি থাকব— মায়ের সেটা ভালো লাগত না। বিশেষভাবে তাঁর খারাপ লাগত ইস্কুলের রান্নাঘরের বামুনদের বিশ্রী রান্না আমাকে খেতে হচ্ছে মনে করে। কিন্তু বাবার বিশেষ ইচ্ছে আমি অন্যান্য ছেলেদের মতো বোর্ডিঙে থাকি, তাই তিনি কোনো আপত্তি কখনো প্রকাশ করেন নি। বুধবার ছুটির দিন মা মনের আক্ষেপ মেটাতে চেষ্টা করতেন। বাড়িতে তিনি সেদিন নিজে রান্না করতেন— আমার সঙ্গে বোর্ডিঙের সব ছেলেরাই খেতে আসত। এই নিয়মিত খাওয়াতে কিন্তু আমাদের যথেষ্ট তৃপ্তি হত না— বেশি ভালো লাগত যখন দল বেঁধে অসময়ে এসে মায়ের ভাঁড়ার ঘর লুট করে নিতে যেতুম। তিনি পরে জানতে পেলেও আমাদের কিছু বলতেন না।

শান্তিনিকেতনে নিজেদের বাসের জন্য পৃথক্ বাড়ি তখন ছিল না,

আমরা থাকতুম আশ্রমের অতিথিশালার দোতলায়। রান্নাবাড়ি ছিল দূরে। মা রান্না করতে ভালোবাসতেন, তাই দোতলার বারান্দার এক কোণে তিনি উনুন পেতে নিয়েছিলেন। ছুটির দিন নিজের হাতে রেঁধে আমাদের খাওয়াতেন। মা নানারকম মিষ্টান্ন করতে পারতেন। আমরা জানতুম, জালের আলমারিতে যথেষ্ট লোভনীয় জিনিস সর্বদাই মজুত থাকত— সেই অক্ষয় ভাণ্ডারে সময়ে অসময়ে সহপাঠীদের নিয়ে এসে দৌরাত্ম্য করতে ত্রুটি করতুম না। বাবার ফরমাশমত নানারকম নতুন ধরনের মিষ্টি মাকে প্রায়ই তৈরি করতে হত। সাধারণ গজার একটি নতুন সংস্করণ একবার তৈরি হল, তার নাম দেওয়া হল 'পরিবন্ধ'। এটা খেতে ভালো, দেখতেও ভালো। তখনকার দিনে অনেক বাড়িতেই এটা বেশ চলন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন বাবা যখন মাকে মানকচুর জিলিপি করতে বললেন, মা হেসে খুব আপত্তি করলেন, কিন্তু তৈরি করে দেখেন এটাও উতরে গেল। সাধারণ জিলিপির চেয়ে খেতে আরো ভালো হল। বাবার এইরকম নিত্য নতুন ফরমাশ চলত, মা-ও উৎসাহের সঙ্গে সেইমত করতে চেষ্টা করতেন।

কলকাতায় মা আত্মীয়স্বজনের স্নেহবন্ধনের মধ্যে একটি বৃহৎ পরিবারের পরিবেশের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে সকলেই ভালোবাসত, জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্রী ছিলেন। সেইজন্য কলকাতা ছেড়ে শান্তি-নিকেতনে এসে থাকা তাঁর পক্ষে আনন্দকর হয় নি। অস্থায়িভাবে অতিথি-শালার কয়েকটা ঘরে বাস করতে হল, সেখানে গুছিয়ে সংসার পাতার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষে সেটা যতই কষ্টকর হোক তিনি সব অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নিয়ে ইস্কুলের কাজে বাবাকে প্রফুল্লচিত্তে সহযোগিতা করতে লাগলেন। তার জন্য তাঁকে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি। যখনই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, নিজের অলংকার একে একে বিক্রি করে বাবাকে টাকা দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত হাতে সামান্য কয়েকগাছা

চুড়ি ও গলায় একটি চেন ছাড়া তাঁর কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না। মা পেয়েছিলেন প্রচুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতে সব অন্তর্ধান হল। বাবার নিজের যা-কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল তা আগেই তিনি বেচে দিয়েছিলেন। যে বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা তাঁর সাময়িক শখের জিনিস ছিল না। বহুদিন ধরে যে-শিক্ষার আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে কল্পনার আকারে ছিল তাকেই রূপ দিতে চেয়েছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। তিনি কেবল আদর্শবাদী ছিলেন না, আদর্শকে রূপায়িত না করতে পারলে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা, যতই তা কঠিন হোক-না কেন, তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না। সেই ত্যাগ স্বীকারে মা তাঁর অংশ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের আত্মীয়েরা মাকে এইজন্য ভর্ৎসনা করতেন, বাবাকে তো তাঁরা কাণ্ডজ্ঞানহীন অবিবেচক মনে করতেন। বহুকাল পর্যন্ত বাবাকে, আর মা যতদিন বেঁচেছিলেন তাঁকে, বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বিদ্যালয় সম্পর্কে বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে কয়েক মাস থাকার পর মায়ের শরীর খারাপ হতে থাকল। যখন নিতান্তই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হল। বাবা তখন কলকাতায়, দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথকে লিখলেন মাকে নিয়ে কলকাতায় আসতে। বোলপুর থেকে কলকাতায় মাকে নিয়ে সেই যে যাওয়া— আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে একটি সামান্য কারণে। মা শুয়ে আছেন, আমি তাঁর পাশে বসে জানলা দিয়ে একদৃষ্টে দেখছি— কত তালগাছের শ্রেণী, কত বুনো খেজুরের ঝোপ, কত বাঁশঝাড়ে ঘেরা গ্রামের পর গ্রাম, কখনো চোখে পড়ল মস্তবড়ো মহিষের পিঠে নির্ভয়ে বসে আছে এক বাচ্চা ছেলে— এই-সব গ্রাম্য দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে সিনেমার ছবির মতো চলে যাচ্ছে।

একসময়ে নজরে পড়ল জনশূন্য মাঠের মাঝে ভাঙা পাড় অর্ধেক বোজা একটি পুকুর— তার যেটুকু জল আছে, ঢেকে গেছে অসংখ্য শাদা পদ্মফুলে। দেখে এত ভালো লাগল, মাকে ডেকে দেখালুম। তার পর কত বছর গেছে, প্রতিবারই বোলপুর কলকাতা যাতায়াতের সময় সেই পদ্মপুকুর দেখার চেষ্টা করি। কেবল দেখতে পাই— পুকুরে জল নেই, মাটি ভরে মাঠের সঙ্গে পুকুর সমান হয়ে গেছে, পদ্ম সেখানে আর ফোটে না।

কলকাতায় এসে মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা কী অসুখ ধরতে না পারায় বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাতে লাগলেন। তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ ডাক্তাররা— প্রতাপ মজুমদার, ডি. এন. রায় প্রভৃতি সর্বদাই বাড়িতে আসতে থাকলেন। তাঁরা সকলেই বাবাকে সমীহ করতেন, এমন-কি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁদের সমকক্ষ মনে করতেন। মায়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁরা ব্যবস্থা দিতেন। এঁদের চিকিৎসা ও বাবার অক্লান্ত সেবা সত্ত্বেও মা সুস্থ হলেন না। আমার এখন সন্দেহ হয় তাঁর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছিল। তখন এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা ছিল না, অপারেশনের প্রণালীও আবিষ্কৃত হয় নি।

মৃত্যুর আগের দিন বাবা আমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যাপার্শে তাঁর কাছে বসতে বললেন। তখন তাঁর বাক্‌রোধ হয়েছে। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে কেবল নীরবে অশ্রুধারা বইতে লাগল। মায়ের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমাদের ভাইবোনদের সকলকে সে রাত্রে বাবা পুরানো বাড়ির তেতলায় শুতে পাঠিয়ে দিলেন। একটি অনির্দিষ্ট আশঙ্কার মধ্যে আমাদের সারা রাত জেগে কাটল। ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে বারান্দায় গিয়ে লালবাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা, নিস্তব্ধ, নিঝুম; কোনো সাড়াশব্দ নেই সেখানে। আমরা তখনি বুঝতে পারলুম আমাদের মা আর নেই, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সমবেদনা জানাবার জন্য সেদিন রাত পর্যন্ত লোকের ভিড়। বাবা

সকলের সঙ্গেই শান্তভাবে অসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে কথা বলে গেলেন, কিন্তু কী কষ্টে যে আত্মসংবরণ করে তিনি ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছিলুম। একমাস ধরে তিনি অহোরাত্র মার সেবা করেছেন, নার্স রাখতে দেন নি, শ্রান্তিতে শরীর মন ভেঙে পড়ার কথা। তার উপর শোক। যখন সকলে চলে গেল, বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে মায়ের সর্বদা ব্যবহৃত চটিজুতো জোড়াটি আমার হাতে দিয়ে কেবলমাত্র বললেন, 'এটা তোর কাছে রেখে দিস, তোকে দিলুম।' এই দুটি কথা বলেই নীরবে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। মায়ের সেই চটি এখন রবীন্দ্রসদনে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।

মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই আমরা শান্তিনিকেতনে চলে এলুম। বাবা বিদ্যালয়ের কাজে আরো যেন মন ঢেলে দিলেন। কাজের ফাঁকে নিভৃতে বসে শোকদগ্ধ হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করলেন গুটিকতক কবিতায়— যা বই আকারে পরে বেরিয়েছিল 'স্মরণ' নাম দিয়ে।

'পিতৃস্মৃতি' (১৩৭৩), পৃ. ৭৯-৮২

৮. মীরা দেবী

মাকে আমার স্পষ্ট মনে না থাকলেও আবছায়া-মতো মনে পড়ে। খানিকটা হয়তো বাস্তবে ও কল্পনায় মিশে গেছে, যেটুকু মনে আছে তাই বলছি।

মায়ের সুনাম ছিল রান্নার। বাবা তাঁকে দিয়ে নানারকম রান্না ও শরবতের পরীক্ষা করাতে ভালোবাসতেন। এক সময় বাবা শিলাইদায় পদ্মার চরে আমাদের নিয়ে 'পদ্মা' নামে বজরাতে ছিলেন। তখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রায়ই শিলাইদায় যেতেন। তাঁরা পদ্মার উপর বোটে থাকতে খুব ভালোবাসতেন।

আমাদের দুটি বজরা ছিল, তাই তাঁরা গেলে কোনো অসুবিধা হত না। একটি বোটের নাম আগেই উল্লেখ করেছি, অপরটির নাম ছিল 'আত্রাই'। আমাদের আর-একটি পরগনাতে আত্রাই নদী ছিল, তার থেকে আত্রাই নামকরণ করা হয়েছিল।

মনে পড়ছে আচার্য জগদীশচন্দ্র কচ্ছপের ডিম খেতে খুব ভালো-বাসতেন। পদ্মার চরে বালির মধ্যে গর্ত করে কচ্ছপ ডিম পেড়ে রেখে যেত। বালির উপর তাদের পায়ের দাগ অনুসরণ করে যে লোকে ধরে ফেলত তারা কোথায় ডিম পেড়ে গেছে— বেচারিরা কী করে আর বুঝবে? কচ্ছপের ডিম জগদীশবাবুর এত প্রিয় ছিল যে কলকাতায় যাবার সময় অনেকগুলো করে ডিম নিয়ে যেতেন।

জগদীশচন্দ্র ও জগদিন্দ্রনাথ যখন শিলাইদায় যেতেন, বাবা তখন মাকে দিয়ে নূতন রান্না করাতেন। মায়ের হাতের রান্না খেয়ে তাঁরা খুব খুশি হতেন। পরে বড়ো হয়ে তাঁদের মুখে মায়ের রান্নার প্রশংসা অনেক শুনেছি। মায়ের যে শুধু রান্নার সুনাম ছিল তা নয় তাঁর ভাগ্‌নে ভাগ্‌নিরা, ভাশুরপো ও তাদের বউরা সকলে তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। আমার এক পিসতুতো বোন দুঃখ করে আমার কাছে বলেছিলেন যে মামি গিয়ে মামাবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে।

শিলাইদা থেকে আমরা শান্তিনিকেতনে ফিরে এলুম। সেখানে অতিথিশালায় ছিলুম। সেখানকার একটা ছবি মনে পড়ে— সরু এক ফালি বারান্দায় একটা তোলা উনুন নিয়ে মা বসে রান্না করছেন আর তাঁর পিসিমা রাজলক্ষ্মী-দিদিমা তরকারি কুটতে কুটতে গল্প করছেন।

আর-একটা ছবি মনে পড়ে— শান্তিনিকেতন-বাড়ির দোতলার গাড়ি-বারান্দার ছাতে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, মার হাতে একটা ইংরেজি নভেল, তার থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিদিমাকে পড়ে শোনাচ্ছেন। গল্প শোনবার লোভে কোনো কোনো সময় তাঁদের গল্পের আসরে গিয়ে

বসতুম। তাই বার বার শুনতে শুনতে বইটার একটি মেয়ের নাম কী করে যে মনের মধ্যে গাঁথা থেকে গেছে খুবই আশ্চর্য লাগে। আমার তখন ইস্টলিনের রোমান্সে আকৃষ্ট হবার বয়স নয়। তবু বোধ হয়, মার গল্প বলার ধরনে ও তাঁর কণ্ঠস্বরে যে বেদনা ফুটে উঠত তাতে আমার শিশুমনে একটা ছাপ রেখে গিয়েছিল। তাই বার্‌বারা নামটা মনে রয়ে গেল।

কিছুদিন পরে মার অসুখ করলে তাঁকে কলকাতায় আনা হল। এখন যেটাকে বিচিত্রা বলা হয়, আমরা ঐখানে থাকতুম। তখন আমরা ঐ বাড়িকে হয় লালবাড়ি নয় নতুন বাড়ি বলতুম। লালবাড়ির ঘরের একটু বিশেষত্ব ছিল। এক ধারে দেয়াল অবধি মস্ত বড়ো আলমারি প্রায় ছাত-সমান উঁচু। আলমারির কাচের পাল্লায় টুকটুকে লাল রঙের শালু আঁটা। আর-এক ধারে একটু ফাঁক ছিল, সেখানে পাতলা কাঠের দরজা, তার মাথার উপর এবং নীচের দিকে ফাঁকা। অনেক সময় রেস্তোরাঁয় এরকম দরজা দেখা যায়। হাত দিয়ে ঠেলা দিলে খুলে গিয়ে তখনি আবার বন্ধ হয়ে যেত। একটা বড়ো ঘরকে এইভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করে তিনটি ঘরে পরিণত করা হয়েছিল। একটা ঘরে আমরা থাকতুম। সব চেয়ে শেষের পশ্চিমের ঘরে মাকে রাখা হল নিরিবিলি হবে বলে। আমাদের বাড়ির সামনে গগনদাদাদের বিরাট অট্টালিকা থাকাতে নতুন বাড়ির কোনো ঘরে হাওয়া খেলত না। সে বাড়িতে তখন বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না, তাই একমাত্র তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করা ছাড়া গতি ছিল না। ঐ বাতাসহীন ঘরে অসুস্থ শরীরে মা না জানি কত কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু বড়োবউঠান হেমলতা দেবীর কাছে শুনেছি যে বাবা মার পাশে বসে সারা রাত তালপাখা নিয়ে বাতাস করতেন।

'স্মৃতিকথা', ১৩৯৩, পৃ. ১৬-১৮

৯. অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শমীর সহিত দিন কাটিত বলিয়াই হয়ত আমার জীবনে আমি আর এক জনের স্নেহের পরিচয় অত্যন্ত সহজে পাইয়াছিলাম। আজও মনে পড়ে, এক দিন সকালে পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া, শমী, আমি ও আমাদের মাষ্টার-মহাশয় জগদানন্দবাবু ক্রিকেট খেলায় মত্ত ছিলাম, এমন সময়ে মাঠের পথে দুইটি ভদ্রমহিলাকে যাইতে দেখিলাম। পরে জানিয়েছিলাম, তাঁহারা শমীর মা ও পিসিমা। শমী ব্যাট ফেলিয়া তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া গেল। আমি বল কুড়াইবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম, শমীর পশ্চাতে পশ্চাতে আমিও ছুটিলাম। কেন যে ছুটিয়াছিলাম তাহা আজও বলিতে পারি না— বোধ হয়, শমী যাহা করিত তাহাই আমারও করিতে ভাল লাগিত বলিয়া যাহা হউক, আমি কতক দুর মাত্র ছুটিয়া গিয়াছি, দেখিলাম, শমী তাহার পিসিমার কাছে পৌছাইয়া গিয়াছে ও তাহার পিসিমা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতেছেন। আমার গতি থামিয়া গেল, আমি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলাম। মনে হইল, আমি কেন ছুটিয়া যাইতেছি, আমাকে কোলে বা বুকে লইবার এখানে তো কেহ নাই। কতক্ষণ হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না। তার পরই অনুভব করিলাম, শমীর মা আমার কাছে আসিয়া আমাকে তাঁহার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তখন আমার পক্ষে আর শান্ত থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমার দুই চক্ষু দিয়া যে অশ্রুধারার বর্ষণ হইয়াছিল, তাহার ফলে শমীর মা আমারও মা হইয়া গেলেন। তাঁর সেদিনকার প্রাতভ্র্মণের ব্যাঘাত ঘটিল, আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজ গৃহে ফিরিলেন। সেদিন প্রায় সমস্তক্ষণই আমি তাঁহার কাছে কাছে ছিলাম এবং পরে তাঁহারই কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। তার পর হইতে তাঁহার কাছে আমি প্রায়ই যাইতাম, তাঁহার শয়ন-ঘরে ঘুমাইতাম। শমীর মা ত শুধু আমার মা ছিলেন না, আমরা যে তাঁহাকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া

জানিতাম। তিনি কত সময়ে আশ্রমের রান্নাঘরে আসিয়া আমাদের জন্যও কত কি যে রান্না করিতেন। মনে পড়ে, সে-সময়ে আমরা আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতাম ও কখন তিনি আমাদের ডাকিবেন ও খাইতে দিবেন তাহার জন্য অধীর হইয়া থাকিতাম।

"শান্তিনিকেতনের স্মৃতি"
'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৪৭, পৃ. ৫৭১-৭২

১০. যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

...একটা বিষয়ের উল্লেখ না করিলে আশ্রমের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ধীরেনের মুখে শুনিয়াছিলাম আশ্রমে এক বার তাহার জ্বর হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর পত্নী সেই সংবাদ শুনিয়া ধীরেনকে ছাত্রবাস হইতে নিজের কাছে লইয়া যাইবার জন্য একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দেন। জ্বরটা তিন-চারি দিন ছিল, সে-সময় তাহাকে দুধ ও জল-সাবু খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। দশ বৎসরের বালক জলসাগু খাইতে আপত্তি করিলে রবীন্দ্রবাবুর পত্নী তাহাকে কাছে বসাইয়া পিঠে হাত বুঝাইতে বুলাইতে 'লক্ষ্মী আমার, যাদু আমার, এইটুকু খেয়ে ফেল, তাহলে তোমার জ্বর ভাল হয়ে যাবে" প্রভৃতি বলিয়া সাগুখাওয়াইতেন। আশ্রমে কোন বালকের পীড়া হইলে তিনি রোগীকে উপরে আপনার কাছে আনাইয়া স্বয়ং তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। পরবর্তী কালে দেখিয়াছি, ধীরেন যখনই কবি-পত্নীর কথা বলিত, তখনই তাহার নয়নযুগল সজল হইয়া উঠিত।

"বিশ্বভারতীর অঙ্কুর"
'প্রবাসী', মাঘ ১৩৪৬, পৃ. ৫১০

১১. সত্যরঞ্জন বসু

...শিলাইদহ হইতে বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের পর শান্তিনিকেতনে আসিলেন সপরিবারে। কবি-গৃহিণী মৃণালিনী দেবী নিজে রন্ধন করিয়া অন্যকে খাওয়াইতে বড়োই ভালোবাসিতেন। বড়ো ছেলে রথীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের ছেলেদের সঙ্গে থাকে, খায়। তাই তিনি বিদ্যালয়ের সকল ছেলের জন্যই রোজ বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শরীর যখন খুবই খারাপ হইয়া পড়িল কবি সকলকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন।

'ত্রিপুরায় রবীন্দ্রস্মৃতি'
'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা', পৃ. ৮৬

ব্রজেন্দ্রকিশোর বলিলেন, "সে এক অপরূপ অভিজ্ঞতা— অনুভূতিও।" কবি-গৃহিণীর যত্ন ও আদর তিনি ভুলিতে পারেন না। কতরকম রান্না করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন যেন নিজের ছেলেটি। কবিও মাঝে মাঝে ফরমাইশ দিতেন নানারকম তরকারীর। আরও চমৎকার, 'রান্নার পদ্ধতিও বাৎলাইয়া দিতেন, কবি, গৃহিণীকে— বলিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। কি আনন্দে নিরঙ্কুশভাবে শিলাইদহের দিনগুলি তিনি কাটাইয়াছেন তাহারই স্মৃতি আজ তাঁহাকে মোহিত করে। বিশেষ করিয়া স্বল্প মৃদুভাষী কবি-গৃহিণীর আপন-করা ব্যবহারে তিনি পরিবারের একজন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

'ত্রিপুরায় রবীন্দ্রস্মৃতি'
'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা', পৃ. ৭৮

··· কবি-গৃহিণী উনত্রিশ বৎসরে দেহত্যাগ করিলেন ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সনে। গৃহলক্ষ্মীর তিরোধান সত্ত্বেও কবির কাব্যলক্ষ্মীর সেবা অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতির অসাধারণত্বের পরিচয় বিস্ময়মুগ্ধ করে। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর কবির কাছে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে চিঠি লিখিলেন। কবি-গৃহিণীর স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিল— বিশেষ করিয়া, শিলাইদহে সেই কয়েক দিন অবস্থানের। তিনি বলিলেন, "কী তাঁর স্নেহ, কী তাঁর আপন করে নেওয়ার ব্যস্ততা— আমাদের মিথ্যা আভিজাত্যের মুখোস দূর হয়ে গেল তাঁর স্নেহাঞ্চল আবরণে। তাঁর অভাব আমি নিবিড়ভাবে আজ অনুভব করছি।" কবি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করার পর···

অপিচ দ্র. বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ১০৫-০৬

১২. প্রমথনাথ বিশী

এই বিদ্যালয়কে পরিবারাশ্রম বলা যাইতে পারে। ছাত্রত্ব এখানকার ছাত্রদের রূপ নয়, এখানে তাহারা প্রধানত বালক বালিকা। নিজেদের পরিবার ছাড়িয়া আসিয়া আশ্রম-পরিবারের অন্তর্গত হইয়া পড়িতে তাহারা যেন পারে, সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। শান্তিনিকেতনের একেবারে প্রথম আমলে বিদ্যালয়টি তাঁহার নিজের পরিবারের অন্তর্গত ছিল বলিলেও হয়। তাঁহার পত্নী বালকদের জননী-স্থানীয়া ছিলেন ; রবীন্দ্রনাথের পুত্রদের ও অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে বাসাহারে কোনো প্রভেদ ছিল না, শিক্ষকেরাও এই পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পত্নীবিয়োগের পরে ও ছাত্রসংখ্যাবৃদ্ধিতে এই পরিবার ভাবটি কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া আসে। কিন্তু এই পরিবার-চৈতন্যই শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এখানে কবিপত্নী সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের জ্যোতির প্রভাবে এই মহীয়সী মহিলার প্রভা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, শান্তিনিকেতন-স্থাপনে তিনি যেমন সর্বতোভাব নিজের সাহচর্য, শক্তি, এমন-কি, অনটনের দিনে অলঙ্কারগুলি পর্যন্ত দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, সংসারে তাহা একান্ত বিরল। এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ইতিহাসের পাতায় ইঁহাদের স্মৃতি স্নেহের স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। কবিপত্নী জীবিত থাকিলে বিদ্যালয়-পরিবারটি নিশ্চয় আরো সুপিনদ্ধ হইয়া উঠিত।

'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', পৃ. ১৪১-৪২

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে এবং ব্যক্তিগত আলাপনে কখনো কখনো প্রত্যক্ষ-ভাবে কখনো-বা পরোক্ষে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। নিজ বিবাহ উপলক্ষে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে তিনি যে স্বহস্তলিখিত নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন, কৌতুকে পরিহাসে তাহা বিশিষ্ট ও সমুজ্জ্বল। পত্রটি বর্তমান গ্রন্থে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই পত্র তিনি প্রিয়নাথ সেন ব্যতীত আরো কোনো কোনো বন্ধুকে পাঠাইয়াছিলেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর নিম্নোদ্‌ধৃত রচনা হইতে তাহা জানা যায়—

I was present at Rabindranath's marriage. He sent me a characteristic invitation in which he wrote that his intimate relative Rabindranath Tagore was to be married —"আমার পরম আত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ হইবে।" The marriage took place in Rabindranath's own house and was a very quiet affair, only a few friends being present.

—Nagendranath Gupta, "Some Celebrities",
The Modern Review, May 1927, p. 543.

অধিক বয়সে কথোপকথনচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিবাহপ্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (১৩) গ্রন্থ হইতে তাহা সংকলিত হইল।

"আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই। বৌঠানরা যখন বড় বেশী পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, আমি বললুম, 'তোমরা যা হয় কর, আমার কোনো মতামত নেই।' তাঁরাই যশোরে গিয়েছিলেন, আমি যাই নি।[১] আমি

১ এ বিষয়ে ইন্দিরা দেবী তাঁহার 'স্মৃতিকথা'য় লিখিয়াছেন, "রবিকাকার কনে খুঁজতেও তাঁর বউঠাকুরানীরা... জ্যোতিকাকামশায় আর রবিকাকাকে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যশোর যাত্রা করলেন।" দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ১৩৫

বলেছিলুম, আমি কোথাও যাব না, এখানেই বিয়ে হবে। বিয়ে জোড়া-সাঁকোতে হয়েছিল।"

"সে কি, আপনি বিয়ে করতেও যশোর যান নি?"

"কেন যাব? আমার একটা মান নেই?"

"ভীষণ অহংকার!"

"তা হোক, তাঁরা তোমাদের মত আধুনিকা তো ছিলেন না, এসেছিলেন তো!"

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ-আলোচনায় স্বভাবত বিমুখ হইলেও, শেষ বয়সে কালিম্পঙ-এ মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে আলাপনে বিশ্বভারতীর প্রসঙ্গে কখনো কখনো পারিবারিক প্রসঙ্গ ও পত্নী মৃণালিনী দেবীর কথা স্মরণ করিয়াছেন; মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' হইতে তাহার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি এখানে সংকলন করা গেল:

"...এই যে বিশ্বভারতী এত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছি, আমার অবর্তমানে এর আর মূল্য কি কিছুই থাকবে না? এর পিছনে যে কী পরিশ্রম আছে তা তো জান না— কী দুঃখের সে-সব দিন গেছে যখন ছোটোবৌর গহনা পর্যন্ত নিতে হয়েছে। চারিদিকে ঋণ বেড়ে চলেছে, ঘর থেকে খাইয়ে পরিয়ে ছেলে যোগাড় করেছি, কেউ ছেলে তো দেবেই না— গাড়ি ভাড়া করে অন্যকে বারণ করে আসবে। এই রকম সাহায্যই স্বদেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছি। আর তখন চলেছে একটির পর একটি মৃত্যুশোক, সে দুঃখের ইতিহাস সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। লোকে জানে উনি শৌখীন বড়োলোক। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হয়েছিলুম, আমার সংসারে কিছুমাত্র বাবুয়ানা ছিল না। ছোটোবৌকেও অনেক ভার সইতে হয়েছে, জানি সে কথা তিনি মনে করতেন না।"

মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন— "শারীরিক মানসিক যে দুঃখগুলি অত্যন্ত ব্যক্তিগত, সে সম্বন্ধে তিনি চিরদিন নীরব থাকতেন। তাঁর মুখে তাঁর

পারিবারিক জীবনের কথা খুব কমই শোনা যেত। তবে ইদানীং মাঝে মাঝে বলতেন। বিশেষ করে যে সময়ে শান্তিনিকেতন শুরু করেছিলেন সেই সময়ের কথা বলতে বলতে যেন তিনি সেই তীব্র দুঃখের সম্মুখীন হ'য়ে থেমে যেতেন। তিনি তো সন্ন্যাসী ছিলেন না এবং অন্যান্য কবিদের মত খেয়াল খুশির উদ্দাম মুক্তিতে জীবন ভাসিয়ে দেননি। সাধারণ গৃহস্থের মত সংসারের ভারও তাঁকে পুরোদমেই বইতে হয়েছে। বলতেন, "তোমাদের এখনকার মত আমরা এত বড়মানুষ ছিলাম না। এখন তো তোমাদের দেখি কিছুতেই কুলোয় না। আমার বরাদ্দ ছিল ২০০৲ কী ২৫০৲। তাই এনে ছোটবৌকে দিয়ে দিতুম, ব্যস্। তিনি যা খুশি করতেন, সংসার চালাতেন। আমার সেদিকে কখনো কিছু ভাবতে হ'ত না।

...প্রত্যেকের সমস্ত ব্যবস্থা, পড়ান, বিবাহ, এমন-কি তিনটি সন্তানের মৃত্যুর দুঃখও একলাই বহন করতে হয়েছে। বেলার বিবাহ তাঁর [মৃণালিনীর] মৃত্যুর পূর্বে হয়েছিল। সবই করেছি কিন্তু জালে জড়াইনি। দূরের থেকে করেছি। ছেলেদের মানুষ করা, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সে করেছি, কিন্তু সে যেন একটা intellectual task, সেটা বুদ্ধি বিচার বিবেচনা দিয়ে করেছি পুরুষের মত ভাবেই। রথীদের পড়াতে গিয়েই তো শান্তিনিকেতনের শুরু হ'ল। তখন অবশ্য তিনি ছিলেন এবং যোগও দিয়েছিলেন আমার কাজে। এখনকার ছেলেমেয়েদের মত আমরা অত খুঁতখুঁতে ছিলুম না। আধুনিকভাবে আমাদের বিবাহ হয়নি তো, তাতে কিছুই এসে যায়নি। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তিনি তো চেয়েছিলেন আমার শান্তিনিকেতনের কাজে সঙ্গিনী হবার। বিশেষ ক'রে ইদানীং, অর্থাৎ শেষের দিকে তাঁর একান্ত আগ্রহ হয়েছিল আমার কাজ করবার। কিন্তু সে তো হ'ল না— অল্প পরেই তাঁর সেই ভয়ানক অসুখ হ'ল।...

...তিনি চলে গেলেন তখন আমার এক মুহূর্ত অবসর ছিল না। শান্তিনিকেতন শুরু হয়েছে, হাতে পয়সা নেই, ঋণের পর ঋণ বোঝার মত

চেপে রয়েছে, কাজের অন্ত নেই। তখন নিজের সুখদুঃখকে কেন্দ্র ক'রে মনকে আবদ্ধ করবার অবসরই বা কোথায়। মেজো মেয়ে মৃত্যুশয্যায় আলমোড়ায়। তাকে ফেলেও বারে বারে আসতে হ'ত শান্তিনিকেতনের কাজে। যাওয়া আসা ছুটোছুটি চলছেই। তবে সবচেয়ে কি কষ্ট হ'ত জানো, যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। সংসারে কথার পুঞ্জ অনবরত জমে উঠতে থাকে··· ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলা, বলার জন্যই। এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়,··· সে তো আর যাকে তাকে হয় না। যখন জীবনের এই যুদ্ধ চলেছে, কাজের বোঝা জমে উঠছে, মেয়ে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সেইটেই সব চেয়ে কষ্ট হ'ত যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা [যায়]···"

মৃণালিনী দেবী যখন মৃত্যুশয্যায়, আসন্ন আঘাতের উদ্‌বেগে ও শঙ্কায় কবিচিত্ত ভিতরে ভিতরে মথিত ও উদ্‌বেল। অসাধারণ সংযম ও পৌরুষ কিভাবে রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করিয়াছেন তাহার চিত্র পাওয়া যায় কবি যতীন্দ্র-মোহন বাগচী -লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে, প্রাসঙ্গিক অংশ তাহা হইতে সংকলিত হইল :

"এইবারে কবির ব্যক্তিগত উদারতা ও অন্তরের দিক্‌টা, সে সময় যেমন দেখিয়াছি, তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। প্রতিভার মত সেদিকটাও আমার হৃদয়স্পর্শ করিয়াছিল। কবির পত্নী-বিয়োগের দিন ঘটনাচক্রে আমি তাঁহার গৃহে উপস্থিত ছিলাম। আসন্নমৃত্যু রোগীর বাড়ী, সহসা একবার উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া আসা আমাদের বাঙ্গালী জাতির বিচারে শিষ্টাচার-সঙ্গত নয়। তাহার উপর, কবির সহিত আমার তখন যে সম্বন্ধ, তাহাতে রোগিণীর ঐ অবস্থা দেখিয়া ফিরিয়া আসা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। সমস্ত সকাল বেলাটাই সেখানে বসিয়া সময়োচিত নানা কথাই মনে আসিতেছিল। চিরপুরাতন হইলেও এই কথাই ভাবিতেছিলাম

যে, মানুষ যত বড়ই হউক, নিয়তির হাত হইতে অব্যাহতির কোন উপায় নাই ; রোগ-শোকের কাছে বৃহৎ ক্ষুদ্র বা ভাল-মন্দের ভিন্ন বিচার নাই। ঐ সময় নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন।···

···কবি মাঝে মাঝে নীচে আসিতেছিলেন এবং কিয়ৎক্ষণের জন্য মহারাজকে দু'টী একটি কথা বলিয়া বা ডাক্তার আসিলে, তাঁহার সঙ্গে উপরে উঠিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার সেদিনকার মূর্ত্তিটি আমার মনে আছে। বাকৃবিরল গম্ভীর মুখশ্রী সংযম-কঠিন চেষ্টায় যেন আত্মসংবরণ করিয়া রাখিয়াছে। চোখে অশ্রু নাই। নাসিকায় দীর্ঘশ্বাস নাই ; ঈষৎ আরক্ত মুখমণ্ডলে অবৃষ্টিসংরম্ভ আসন্ন আষাঢ়েরই যেন স্তম্ভিত পূর্ব্বাভাস। ক্ষণে ক্ষণে ঈষৎ স্মিতভাব, রোদনেরই যাহা অব্যক্ত রূপান্তর। বিকার-চাঞ্চল্যহীন সেই মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইতেছিল, কি দুঃসহ বেদনাই না জানি তাহার অন্তরালে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। বেলা বারোটার সময় কবিও উপরে গেলেন, মহারাজও আমাকে আমার বাসায় নামাইয়া দিয়া গৃহে ফিরিলেন।"

মৃণালিনী দেবীর অকালমৃত্যুর পর সেই দুঃখাভিঘাত কবি কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার আভাস পাওয়া যায় সেই সময়ে দীনেশচন্দ্র সেন এবং মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লিখিত তাঁহার দুইখানি অন্তরঙ্গ পত্রে ; 'চিঠিপত্র ১০' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' (১৩৬৮) গ্রন্থ হইতে তাহা বর্তমান গ্রন্থে (পৃ ১০৫-০৬) সংকলিত হইয়াছে।

শিশু কাব্যের অধিকাংশ কবিতা খোকার উদ্দেশে রচিত। কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনকালে, সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেনের পত্নী এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেনকে যে পত্র লেখেন তাহাতেও মৃণালিনী দেবীর স্মৃতি উদ্‌ভাসিত। প্রাসঙ্গিক-বোধে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র কার্তিক ১৩৪৯ সংখ্যা (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৮, পৃ ৪৬) হইতে পত্রটি এই গ্রন্থে (পৃ ১০৬-০৭) সংকলিত হইয়াছে।

ঠাকুরবাড়ির বধূ, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী প্রফুল্লময়ী দেবী, 'প্রবাসী' পত্রের বৈশাখ ১৩৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত "আমাদের কথা"য় সংসার-পরায়ণা গৃহবধূ মৃণালিনী দেবীর যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

[বলুর] বিবাহে [১৮৯৫] খুবই ঘটা হইয়াছিল।... আমার ছোটো জা মৃণালিনী দেবীও সঙ্গে যোগ দিয়া নানারকমভাবে সাহায্য করেন। তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে লইয়া নানারকম আমোদ-আহ্লাদ করিতে ভালোবাসিতেন। মনটি খুব সরল ছিল, সেইজন্য বাড়ির সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসিতেন।

—প্রফুল্লময়ী দেবী, "আমাদের কথা", 'প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৩৭

মন্মথনাথ ঘোষ মৃণালিনী দেবীর অভিনয়ের যে উল্লেখ করিয়াছেন ("কবি-পত্নী", 'মৃণালিনী দেবী', পৃ ১৭) নাট্যস্মৃতি প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী -লিখিত তাহার বিবরণ এ প্রসঙ্গে সংকলনযোগ্য :

'রাজা ও রানী' নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম অভিনয়ের একটু বৈশিষ্ট্য আছে।

...বাড়িটি [বির্জিতলা] জীর্ণ হলেও তার সঙ্গে আমাদের সেকালের অনেক সুখস্মৃতি জড়িত। তারই একতলায় চওড়া বারান্দায় স্টেজ বেঁধে প্রথম, 'রাজা ও রানী'র অভিনয় হয়। তার পাত্রপাত্রী ছিল এইরকম—

বিক্রম	রবিকাকা
সুমিত্রা	মা [জ্ঞানদানন্দিনী দেবী]
দেবদত্ত	বাবা [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর]
নারায়ণী	কাকিমা [মৃণালিনী দেবী]

—ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, 'রবীন্দ্রস্মৃতি'।

মৃণালিনী দেবী

১২৮০ ফাল্গুন। ১৮৭৪ মার্চ ॥ জন্ম : খুলনা জেলার দক্ষিণডিহির ফুলতলা গ্রামে। পিতা বেণীমাধব রায়চৌধুরী। মাতা দাক্ষায়ণী দেবী।

(?) ১২৮৭। ১৮৮০ ॥ শিক্ষারম্ভ : গ্রামের পাঠশালায়। প্রথম বর্গ পর্যন্ত পড়াশুনা।

১২৯০ অগ্রহায়ণ ২৪। ১৮৮৩ ডিসেম্বর ৯ ॥ বিবাহ : দশ বৎসর বয়সে, বাইশ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের সহিত। জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে শুভকার্য সম্পন্ন হয়।

১২৯০ ফাল্গুন ১৯। ১৮৮৪ মার্চ ১ ॥ ইংরেজি শিক্ষা : মহর্ষির আদেশে ইংরেজি শিক্ষার জন্য নববধূকে লরেটো হাউসে স্বতন্ত্রভাবে ভর্তি করার ব্যবস্থা।

১২৯১ বৈশাখ-চৈত্র। ১৮৮৪-৮৫ ॥ এক বৎসর কাল লরেটোতে শিক্ষা লাভ।

(?) ১২৯২ বৈশাখ-চৈত্র। ১৮৮৫-৮৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে মহর্ষিভবনে পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা।

১২৯৩ কার্তিক ৯। ১৮৮৬ অক্টোবর ২৫ ॥ প্রথম সন্তান বেলা বা মাধুরী-লতার জন্ম।

(?) ১২৯৩। ১৮৮৭ ॥ স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখিসমিতি' ও 'শিল্পমেলা'র কর্ত্রীসভার 'সখী'রূপে নির্বাচিতা।

(?) ১২৯৪ চৈত্র। ১৮৮৮ মার্চ-এপ্রিল ॥ স্বামী ও শিশুকন্যাসহ গাজিপুরে গমন ও বাস। এখানে রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ থেকে আষাঢ় এই তিন মাসে 'মানসী'র ২৮টি কবিতা রচনা করেন।

১২৯৫ অগ্রহায়ণ ১৩। ১৮৮৮ নবেম্বর ২৭ ॥ দ্বিতীয় সন্তান রথীন্দ্রনাথের জন্ম।

(?) ১২৯৬ পূজার ছুটি। ১৮৮৯ অক্টোবর-নবেম্বর ॥ কবির সদ্য-প্রকাশিত 'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথম মঞ্চাভিনয়ে মৃণালিনী দেবীর 'নারায়ণী'র ভূমিকায় সার্থক অভিনয় (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলার বাড়িতে)।

১২৯৬ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৯ নবেম্বর-ডিসেম্বর ॥ স্বামী ও পুত্রকন্যা সহ শিলাইদহে পদ্মাবক্ষে 'পদ্মা' বোটে বাস।

১২৯৭ মাঘ ১১। ১৮৯১ জানুয়ারি ২৩॥ তৃতীয় সন্তান রানী বা রেনুকার জন্ম।

১২৯৮ গ্রীষ্মকাল। ১৮৯১ এপ্রিল-মে ॥ স্বামী ও সন্তানগণ সহ প্রথম শান্তি-নিকেতনে আগমন ও 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির (আদি বাড়ি) দোতলায় বাস।

১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯১ মে-জুন ॥ শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতা গমন।

১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ১৮৯২ ॥ দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১২৯৯ অগ্রহায়ণ ৩। ১৮৯২ নবেম্বর ১৭॥ শিশুসন্তানদের ও কুমারী ইন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে সোলাপুরে জ্ঞানদানন্দিনীর নিকট গমন।

১২৯৯ পৌষ ২৯। ১৮৯৩ জানুয়ারি ১২ ॥ চতুর্থ সন্তান মীরা দেবীর জন্ম।

১৩০১ অগ্রহায়ণ ২৮। ১৮৯৪ ডিসেম্বর ১৩ ॥ পঞ্চম ও সর্বশেষ সন্তান শমীন্দ্র-নাথের জন্ম।

১৩০৪ কার্তিক-পৌষ। ১৮৯৭-৯৮ ॥ তৃতীয়বার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১৩০৬ ভাদ্র-১৩০৭ চৈত্র। ১৮৯৯-১৯০১ ॥ শিলাইদহে বাস।

১৩০৮ বৈশাখ। ১৯০১ এপ্রিল-মে ॥ চতুর্থবার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১৩০৮ আষাঢ় ১। ১৯০১ জুন ১৫ ॥ বিহারীলালের পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত প্রথম কন্যা বেলা বা মাধুরীলতার বিবাহ। বিবাহের পূর্বে ২৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহর্ষি বরকে দশ হাজার পাঁচ টাকা যৌতুক দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

১৩০৮ শ্রাবণ ২৪। ১৯০১ আগস্ট ৯ ॥ ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সহিত দ্বিতীয় কন্যা রানী বা রেণুকার এগারো বৎসর ছয় মাস বয়সে বিবাহ। মহর্ষি বরকে যৌতুক স্বরূপ চারটি মোহর দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

১৩০৮ ভাদ্র। ১৯০১ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ॥ পঞ্চমবার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১৩০৮ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯০১ ॥ ষষ্ঠবার শান্তিনিকেতনে আগমন ও বসবাস।

১৩০৮ চৈত্র। ১৯০২ মার্চ-এপ্রিল ॥ সপ্তম ও সর্বশেষবার শান্তিনিকেতনে আগমন ও বাস। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ।

১৩০৯ আষাঢ়। ১৯০২ জুন-জুলাই ॥ শান্তিনিকেতনে রোগাক্রান্ত।

(?) ১৩০৯ ভাদ্র ২৭। ১৯০২ সেপ্টেম্বর ১২ ॥ চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় স্থানান্তরিত।

১৩০৯ অগ্রহায়ণ ৭। ১৯০২ নবেম্বর ২৩ ॥ জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনে দেহাবসান।

ব্যক্তি-পরিচয়

অমলা : চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী

অরু : অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র

আদুদিদি : আদ্যাসুন্দরী দেবী, রথীন্দ্রনাথের মাতা সারদাদেবীর পিসিমা

আমাদের সাহেব : পাবনা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট

আশু : আশুতোষ চৌধুরী, হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবীর স্বামী

কর্তাদাদামশায় : দেবেন্দ্রনাথ

কুঞ্জ : কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী

কৃতী : কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র

ক্ষুদ্রতমা কন্যা : তৃতীয়া কন্যা মীরা

খোকা : জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ

গগন : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুজরাটী বন্ধু : সম্ভবত সুরাটের ধনী ব্যবসায়ী কালাভাই লালুভাই দোশে

গোফুর মিঞা : বাবুর্চি

ছোটকাকামশায় : শমীন্দ্রনাথ

জগদানন্দ : জগদানন্দ রায়

জগদীশদা : সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মাতুল

জগন্নাথ : পুরাতন কর্মচারী

ডাক্তার : সম্ভবত শিলাইদহের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার যদু মুখোপাধ্যায়

তারকবাবু : তারকনাথ পালিত

দিনু : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র

নগেন্দ্র : রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

ন ঠাকুরঝি : স্বর্ণকুমারী দেবী

ন দিদি, রবীন্দ্রনাথের পত্রে : স্বর্ণকুমারী দেবী

ন দিদি, মৃণালিনীদেবীর পত্রে : প্রফুল্লময়ী দেবী, বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
ন বোঠান : পূর্বোক্ত প্রফুল্লময়ী দেবী
নরু : সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী নরেন্দ্রবালা দেবী
নলিনী : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী
নাটোর : জগদিন্দ্রনাথ রায়
নীতু, নীদ্দা : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পুটে : ভৃত্য
প্রজ্ঞা : প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
প্রতাপবাবু : ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
প্রমথ : প্রমথ চৌধুরী
প্রিয়বাবু : প্রিয়নাথ সেন
ফটিক মজুমদার : কুমারখালির বিখ্যাত ধনী
ফুলচাঁদ : কবির পদ্মাবোটের মাঝি
ফুলতলা : খুলনায় মৃণালিনী দেবীর পিত্রালয়
বড়দিদি, বড়পিসিমা : সৌদামিনী দেবী
বলু, বোলতা : রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ
বাবামশায় : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিদ্যেভূষণ : সম্ভবত গৃহভৃত্য
বিপিন : কবির পুরাতন ভৃত্য
বিবি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
বিষ্ণু : গায়ক ও শিক্ষক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়
বিহারীবাবু : বিহারীলাল গুপ্ত
বেলা বা বেলি : কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী
মণীষা : হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
মিস্ পারসেন : শিলাইদহে গৃহশিক্ষয়িত্রী

মীরা : কবির কনিষ্ঠা কন্যা
মেজদি : প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী
মেজবোঠান : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
যদু : খাজাঞ্চি যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
রথী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রমা : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
রানী বা রেণুকা : কবির দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা দেবী
লক্ষ্মী : জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরিচারিকা
লরেন্স : উইলিয়ম লরেন্স, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের শিক্ষক
লাহোরিনী : অক্ষয়কুমার চৌধুরীর স্ত্রী লেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরানী
লোকেন : লোকেন্দ্রনাথ পালিত
শমী : শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎ : জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী
শশাঙ্ক : মৃণালিনীদেবীর আয়া
সত্য, সোদ্দা : রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সরলা : ভাগিনেয়ী সরলাদেবী চৌধুরানী
সুইদা, সুধী : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র
সুবোধ : সুবোধচন্দ্র মজুমদার
সুরেন : সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র
সুশীলা : ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
সুসি : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী সাহানা দেবী
সেজদিদি : নীপময়ী দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
সেজবৌ : নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
হেমলতা দেবী : দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
হেশ : চিত্রকর শশীকুমার হেশ
হৃষী : শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ সহোদর
Mrs Gupta : বিহারীলাল গুপ্তর পত্নী সৌদামিনী দেবী